শ্রীশঙ্করমঠ গ্রন্থাবলী—৩য়

সবলতা ও দুর্ব্বলতা

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী

প্রণীত।

শ্রীশঙ্কর মঠ, বরিশাল।

(দ্বিতীয় সংস্করণ)

১৩৩৩

মূল্য ॥০ আনা।

প্রকাশক——
শ্রীনিশিকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় এম-এ,
শ্রীশঙ্করমঠ, বরিশাল।

দি ক্লিয়ার টাইপ প্রেস,
শ্রীহৃষীকেশ দে দ্বারা মুদ্রিত
১৫ নং কলেজ স্কোয়ার,
কলিকাতা।

পুস্তকপ্রাপ্তি স্থান—
(১) শ্রীশঙ্করমঠ বরিশাল.
(২) সরস্বতী লাইব্রেরী.
৯নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

প্রকাশকের নিবেদন

(দ্বিতীয় সংস্করণ)

সবলতা ও দুর্ব্বলতার প্রথম সংস্করণ যেরূপ অল্প সময়ের মধ্যে সাধারণের নিকট আদৃত হইয়া নিঃশেষিত হইয়াছে তাহাতে আমরা ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিতে বিশেষ উৎসাহিত হইয়াছি।

বর্ত্তমান সংস্করণে শিল্পাচার্য্য শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় একটী "গ্রন্থাভাস" লিখিয়া দিয়া ইহার সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছেন।

ব্রজমোহন কলেজের দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার বসু এম-এ, মহাশয় এই পুস্তকের ভূমিকা লিখিয়া আমাদিগকে অনুগৃহীত করিয়াছেন।

এবার পূর্ব্বের অনেক ভুলভ্রান্তি সংশোধন করত পাঠক-পাঠিকাগণের সুখবোধের বিশেষ চেষ্টা করা হইয়াছে। এই সংস্করণ অনেক পরিবর্দ্ধিত হইলেও সাধারণের সুবিধার জন্য পুস্তকের মূল্য পূর্ব্ববৎ আট আনাই রহিল।

শ্রীশঙ্কর মঠ, বরিশাল	নিবেদক
২০শে ভাদ্র, ১৩৩৩।	শ্রীনিশিকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়।

ওঁ

ভূমিকা

খোঁড়া ভিখারী দুয়ারে বসিয়া কাকুতি করিতেছিল—"দুটি ভিক্ষা পাই মা," এদিকে ঘরে আগুন লাগিয়াছে; গৃহস্থ হতবুদ্ধি হইয়া ছুটাছুটি করিতেছে। এখনই সর্ব্বভুক্ শতজিহ্বা প্রসারিত করিয়া গৃহসামগ্রী সকল গ্রাস করিবে। কোন উপায় নাই। এমন সময়ে ঐ বিকল-দেহ ভিখারী বলিল, "বাবু, ঐ যে ঘরের কোণে জলের কলসী?" এই নৈরাশ্যের মধ্যে, এই সর্ব্বগ্রাসী অগ্নির মুখে দাঁড়াইয়া গৃহস্থ অমৃত-বাণী পাইল, কোমর বাঁধিয়া কর্ম্মে উদ্যোগী হইল।

আজ ভারতের ঘোর দুর্দ্দিন। ভারতের ঘরে ঘরে আগুন লাগিয়াছে; দারিদ্র্যের আগুন, অকালমৃত্যুর আগুন, দুর্ব্বলের প্রতি সবলের অত্যাচারের আগুন, ভ্রাতৃ-বিরোধের আগুন, স্বামী-স্ত্রীর বিবাদের আগুন, চতুর্দ্দিকে আগুন, ভারতবাসী পুড়িয়া ছাই হইতেছে। কিন্তু উপায় নাই; ভারতবাসী আজ চঞ্চল, অস্থির, প্রমত্ত। কখনও পশ্চিমে, কখনও পূর্ব্বে; কখনও উত্তরে আবার কখনও দক্ষিণে ধাবমান। কোথা পথ? কিন্তু সাড়া নাই, শব্দ নাই, আশ্বাসের কোন লক্ষণ নাই। এমন সময়ে শ্রীমৎ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ অতি প্রাচীন পন্থা

নূতন করিয়া ভারতীয় যুবকের সম্মুখে উন্মুক্ত করিয়াছেন—বল সাধনা। প্রাচীন? অতি প্রাচীন। বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে, শুভ্র হিমাদ্রিশিখরে, শ্বাপদ-সমাকীর্ণ গিরিকন্দরে, ধীর সমীরণান্দোলিত তরঙ্গরাজি-চুম্বিত নদীপুলিনে বসিয়া আর্য্যঋষি ধ্যানস্তিমিতনেত্রে ব্যোম-পটে জ্বলন্ত অক্ষরে অঙ্কিত পন্থা দেখিয়া গাহিয়াছিলেন,—"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।" "যোঽসাবসৌপুরুষঃ সোঽহমস্মি।" এই ধ্বনি দিগন্ত প্লাবিত করিয়াছিল। ভারতে আর্য্য সন্তান আগ্রহে শুনিয়াছিল; এই অগ্নিমন্ত্র আদরে গ্রহণ করিয়াছিল। সুরপুরে ইন্দ্র লজ্জায় মলিন হইয়াছিলেন, ধনকুবের মস্তক হেঁট করিয়াছিলেন, আর বোধকরি ভয়ে কাঁপিয়াছিলেন "মৃত্যু"। কিন্তু আজ ভারতের সে দিন ফুরাইয়াছে, আজ ভারতবাসী আত্মজ্ঞানের মাহাত্ম্য ভুলিয়াছে। স্বামীজি এই গুপ্তনিধির উদ্ধার করিয়া—দেশের আশার পথ খুলিয়া দিয়াছেন। ধর্ম্মাশক্ত ভিখারীর বাক্যও যখন মুমূর্ষুর প্রাণে শক্তি-সঞ্চার করিতে পারে, তখন স্বামীজির জ্ঞানগর্ভ, তেজস্বিতাপূর্ণ মহাবাক্য কি অবশপরাণ ভারতবাসীকে উৎসাহিত করিবে না?

এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় লেখক দেখাইয়াছেন—পরমেশ্বর তেজঃস্বরূপ, বলস্বরূপ। তাঁহার আরাধনাই বলের সাধনা। ভ্রান্তি হইতে দুর্ব্বলতার উৎপত্তি। এই মোহ, এই ভ্রান্তি দূর করিবার জন্য মানুষের সাধনার প্রয়োজনীয়তা। সাধনবলে মানুষ যখন উপলব্ধি করে

সে আত্মস্বরূপ, সে মহান্, সে বিরাট্, তখনই সে অভয় প্রাপ্ত হয়। বলসাধনার চরম ফল আত্মদর্শন। মানুষের মাত্র বুঝিতে হইবে যে সে আত্মা, ব্রহ্মস্বরূপ; নূতন কিছু উৎপন্ন করিতে হইবে না। আত্মজ্ঞান হইলে আর মোহ মানুষকে আচ্ছন্ন করিতে পারেনা, সে তখন নিজের দীপ্তিতে প্রকাশিত হয়। "রাজ-পুত্রবৎ তত্ত্বোপদেশাৎ।" 'আমি রাজপুত্র' এই জ্ঞান জন্মিলে, আর নীচসঙ্গ করিবার প্রবৃত্তি থাকেনা। অরুণ-সারথি সহস্রাংশু পূর্ব্ব তোরণে পদার্পণ করিলেই অন্ধকাসুর ভয়ে পলাইয়া যায়। সেইরূপ আমি অমৃতের পুত্র, নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব—এই জ্ঞান জন্মিলে মায়া রাক্ষসী আপনিই চলিয়া যায়। উপনিষদের এই মহামন্ত্র স্বামীজি সংক্ষেপে, সরল অথচ সতেজ ভাবে উপস্থিত করিয়াছেন।

তৃতীয় অধ্যায় পাঠে পাঠক হয়ত ভাবিতে পারেন লেখক সবলতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে কোন পার্থক্য স্বীকার করেন নাই। কিন্তু পরবর্ত্তী অধ্যায় পাঠ করিলেই লেখকের মনোভাব স্পষ্টরূপে জানা যায়। তিনি সংযম শিক্ষা দিয়াছেন। বস্ত্র-হরণ উপাখ্যানে তিনি যুধিষ্ঠিরের অলৌকিক সংযম, ধীরতা ও সহিষ্ণুতাকে সবলতার প্রকৃষ্ট উদাহরণরূপে দেখাইয়াছেন। ইহাই লেখকের প্রধান উপদেশ।

গুরুবাদের কথা অতি সরল ভাবে বুঝাইয়াছেন। গুরু ভিন্ন মানুষের চলে না। জন্মাবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত

মানুষ গুরুর মুখাপেক্ষী। অবধূত পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ সকলকেই গুরু বলিয়া প্রণাম করিয়াছেন। ব্যক্তি মাত্রেরই প্রতিমুহূর্ত্তে গুরুর উপদেশের অপেক্ষা আছে।

স্বামীজি বেদবেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্র, পাশ্চাত্যদর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতির পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনাদ্বারা মাত্র একটি কথা বলিয়া গিয়াছেন—"সংযমবলে আত্মজ্ঞান লাভ"—ইহাই বল সাধনা। যদিও দার্শনিকের মত বিশ্লেষণ প্রভৃতি দ্বারা কোন সিদ্ধান্তের অবতারণা করেন নাই, তথাপি লেখকের আবেগপূর্ণ ভাষায় উপস্থাপিত ঋষিগণের প্রাচীন গাঁথা মৃতপ্রায় ভারত-যুবকের প্রাণে শক্তিসঞ্চার করিবে, ইহা আশা করা অসঙ্গত নয়।

"বেদান্ত-দর্শনের ইতিহাস" প্রভৃতি উপাদেয় গ্রন্থ-প্রণেতা শ্রীমৎ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতীর ইহা অপেক্ষা অধিক পরিচয়ের প্রয়োজন নাই। অলমতিবিস্তরেণ।

বরিশাল,
৬ই আষাঢ় ১৩৩৩

শ্রীহেমন্ত কুমার বসু,
অধ্যাপক, ব্রজমোহন কলেজ, বরিশাল।

প্রস্থাভাস

নৌকা চলে জল কেটে, তুফান ঠেলে নৌকার মাঝি যতক্ষণ বসে আছে হাল ধরে।

নৌকা ডোবে, নৌকা চড়ায় বাধে, নৌকা জলের তলায় তলিয়ে যায় যদি না থাকে মাঝি কিম্বা যদি হয় মাঝি আনাড়ি ভীরু ক্ষেপা।

ফুটোনৌকো-জীর্ণতরী ভাল মাঝিতেও তাকে পারে নিতে হারে।

জীবন নদীর এপার ওপাব জীবের গতাগতি— এই নৌকা ও মাঝির সম্পর্ক ধবেই—মন মাঝি দেহ তরী, পাড়ি দিচ্ছে দুজনে অগাধ জলে—

মাঝি হাবে তো নৌকা হারে, নৌকা হারে তো মাঝি হারে, এ ছাড়া অন্য কথা নেই।

কলিকাতা
২৪শে ভাদ্র, শুক্রবার,
১৩৩৩। } শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
ভূমিকা ...	/০
গ্রন্থাভাস ...	।/০
১। সবলতা বনাম দুর্ব্বলতা ...	১
২। বলের উৎস	৯
৩। সবলতার সাধনা	২০
৪। সাধনের রূপ ...	৩৬
৫। নৈতিক সমস্যা	৪২
৬। বিচারের মানদণ্ড	৫০
৭। সবলতার স্বরূপ	৮৬

সবলতা ও দুর্ব্বলতা

প্রথম অধ্যায়

সবলতা বনাম দুর্ব্বলতা।

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।" বীর্য্যহীন ব্যক্তি আত্মলাভ করিতে পারে না। ব্রহ্মনিষ্ঠাজনিত বীর্য্য যাহার নাই, তাহার পক্ষে ব্রহ্মলাভের চেষ্টা বিড়ম্বনা, শ্রুতি জলদগম্ভীর স্বরে ইহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। ভগবৎলাভের সাধনায় ব্রহ্মবীর্য্য লাভই প্রধান সহায়। ভগবান্‌ও গীতায় দৈবী সম্পদের মধ্যে প্রথমেই বলিয়াছেন "অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধিঃ" (অভয় এবং চিত্তপ্রসন্নতা)। ব্রহ্মই অভয়, সংসারই ভয়; তাই শ্রুতিতে দেখিতে পাই "অভয়ং বৈ প্রাপ্তোঽসি" (তুমি অভয় প্রাপ্ত হইয়াছ)। অভয় প্রাপ্তির সাধনও অভয়, নির্ভীক পুরুষই আত্মলাভে সমর্থ। "আত্মনা বিন্দতে বীর্য্যং, বিদ্যয়া বিন্দতেঽমৃতম্" জীবাত্মার জ্ঞানে অণিমাদি ঐশ্বর্য্য লাভ হয় আর বিদ্যা বা পরমাত্মার জ্ঞানে মোক্ষলাভ হইয়া থাকে (কেন, ২।৪)। শ্রুতি উদাত্তকণ্ঠে ইহাই বিঘোষিত করিয়াছেন। শ্রুতির প্রার্থনায় দেখিতে

পাই "বলমসি বলং ময়ি ধেহি, তেজোঽসি তেজোময়ি ধেহি, বীর্য্যমসি বীর্য্যংময়ি ধেহি, ওজোঽসি ওজোময়ি ধেহি, সহোঽসি সহোময়ি ধেহি, মন্যুরসি মন্যুংময়ি ধেহি।" তুমি বলস্বরূপ, আমার বল বিধান কর; তুমি তেজঃস্বরূপ, আমাকে তেজ দাও; তুমি মানসিক বীর্য্যস্বরূপ, আমাকে মানসিক বীর্য্য দাও; তুমি বুদ্ধির বলস্বরূপ, আমাকে বুদ্ধির বল দাও; তুমি সহিবার শক্তিস্বরূপ, আমাকে সহিবার শক্তি দাও; তুমি ক্রোধ-স্বরূপ, আমাকে দুষ্ট দানব প্রভৃতি বিনাশ করিবার শক্তি দাও। সর্ব্বত্রই বলের উপাসনা; বলবীর্য্য তেজই ব্রহ্ম; তাঁহার নিকট ইহাই প্রার্থনা করা হইতেছে। "য আত্মদা বলদা যস্য বিশ্ব উপাসতে * * কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম" যিনি আত্মনিষ্ঠাজনিত বীর্য্যদান করেন, যিনি বল বিধান করেন, সমস্ত বিশ্ব যাঁহার উপাসনা করে, সেই দেবতাকে আমরা হবিদ্বারা পরিচর্য্যা করিব। ব্রাহ্মণ সন্তান "ব্রহ্মবর্চ্চস কামার্থং প্রাতঃ সন্ধ্যামুপাস্মহে" ব্রহ্মতেজ লাভ করিবার জন্যই সন্ধ্যা করিতেছেন। সূর্য্য তেজের আধার বলিয়া তাহাতেই ব্রহ্মদৃষ্টিপূর্ব্বক আরাধনা করিয়া ব্রহ্মতেজ লাভ করিতে চেষ্টা করিতেছেন। সবলতা লাভের জন্যই সকল

সাধনা। ভগবানই সবলতা, তিনিই অভয়, তিনিই বীর্য্যস্বরূপ, তিনিই তেজঃস্বরূপ, তাঁহা হইতে যাহা পৃথক্ তাহাই দুর্ব্বলতা, তাহাই পাপ। সবলতাই ভগবান্, সবলতাই পুণ্য, আর দুর্ব্বলতাই পাপ।

দুর্ব্বলচিত্ত ব্যক্তির সাধন হয় না, দুর্ব্বল ব্যক্তিরই সংশয় অত্যন্ত বেশী, সংশয়াত্মার সাধনা হইতে পারে না। "সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।" সবলতাই সংসারের মূল। "যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ" তাঁহার তপস্যাই জ্ঞানময়। এ তপস্যা চেষ্টা নহে, ইহা জ্ঞান। "স্বাভাবিকী জ্ঞানবল ক্রিয়া চ", তাঁহার জ্ঞান, ক্রিয়া, বল স্বাভাবিক। যে জিনিষটা আয়ত্ত করিতে হইবে সেই জিনিষটার শক্তি হইতে আমার শক্তি অধিক হওয়া আবশ্যক। প্রবল বলশালী অশ্বের বেগ আমি প্রতিরোধ করিতে পারি না, আমার সেরূপ শক্তি নাই।

সূর্য্য শক্তিমান্ বলিয়াই সৌরজগৎ বিধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। সূর্য্যের অনন্ত শক্তিতেই গ্রহ উপগ্রহাদি ঐককেন্দ্রিক হইয়া এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিপর্য্যস্ত হয় না। সূর্য্যের সবলতায় সৌরজগত বিধৃত, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তিতে পৃথিবীর বস্তুসকল তাহারই দিকে আকৃষ্ট হইতেছে। অচিন্ত্য শক্তিতেই অণুপরমাণু সকল

সংহত ও সংবদ্ধ হইতেছে। শক্তিমান্ বলিয়াই গুরু শিষ্যকে আকর্ষণ করিতেছেন। শক্তিসম্পন্ন পুরুষ রাজরূপে শাসন করিতেছেন। পিতা সবল বলিয়া পুত্রকে পালন করিতেছেন। বাস্তবিক পক্ষে সিংহ প্রবল বলশালী বলিয়া পশুরাজ। সংসারের সর্ব্বত্রই সবলতার পূজা হইতেছে, কারণ সবলতাই ভগবান্। রামায়ণে বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের নিকট পরাভূত হইয়া বুঝিলেন, "ক্ষাত্রশক্তির মূলে ব্রাহ্মণশক্তি", ক্ষাত্রশক্তি ও ব্রাহ্মণশক্তি উভয়ে মিলিয়া জগৎ ধারণ করিয়া রাখে। যখন দেখিলেন ক্ষাত্রশক্তি, ব্রাহ্মণশক্তিকর্ত্তৃক পরাহত হইল, তখন বলিলেন, "ধিগ্ বলং ক্ষত্রিয়বলং ব্রহ্মতেজো-বলং বলম্।" ক্ষত্রিয়বল ব্রাহ্মণবল দ্বারা পরিপুষ্ট হইলেই সমস্ত জগৎকে শাসনে রাখিতে পারে। রাজ-ধর্ম্মেতে রাজার ব্রাহ্মণগণকে রক্ষা করিবার ও সেবা করিবার বিধানের মূলেও সেই সত্যটিই নিহিত। গৌতম বলিয়াছেন "ব্রহ্মপ্রসূতং হি ক্ষত্রমৃধ্যতে ন ব্যথতে ইতি চ বিজ্ঞায়তে। ব্রহ্মক্ষত্রেণ সম্প্রবৃত্তং দেবপিতৃ-মনুষ্যান্ ধারয়তীতি বিজ্ঞায়তে।" মনু বলিয়াছেন :—

"ন ব্রহ্ম ক্ষত্রমৃধ্নোতি ন ক্ষত্রং ব্রহ্ম বর্দ্ধতে।
ব্রহ্ম ক্ষত্রঞ্চ সংপৃক্তমিহ চামুত্র বর্দ্ধতে।" ৯।৩২২

বাস্তবিক, ক্ষাত্রশক্তি ও ব্রাহ্মণশক্তি উভয়ে মিলিয়া নিয়মাদির শৃঙ্খলা রক্ষা করিতেছে, তাহাতেই জগতের স্থিতি রক্ষিত হইতেছে। রামায়ণে বিশ্বামিত্র-বশিষ্ঠ সংবাদে উহা বিশেষরূপে পরিস্ফুট হইয়াছে। উদ্দাম রাজশক্তি নৈতিক ব্রাহ্মণশক্তির নিকট পরাহত। উভয় শক্তির আধার এক হইলেও, গতি বিভিন্ন দিকে। উহা এক দিকে প্রবাহিত হইলেই জগতের মঙ্গল সংসাধিত হয়। ক্ষত্রিয়শূন্য দেশে ব্রাহ্মণশক্তি থাকিতে পারে না, বাহিরের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য ক্ষাত্রশক্তির আবশ্যকতা। আবার আভ্যন্তরীণ আক্রমণ হইতে রক্ষা করার জন্য ব্রাহ্মণশক্তির আবশ্যকতা। জগতের শৃঙ্খলায় শক্তিই মূল, পৃথিবীর ভূতগ্রামের শাসনে, স্থিতিতে শক্তিই মূল, শক্তিই সবলতা। দুর্ব্বলের প্রতিরোধ করিবার শক্তি নাই, তাই দুর্ব্বলের রোগও বেশী হয়। দুর্ব্বল ব্যক্তির বাসনাও প্রবল। বৃদ্ধাবস্থায় ইন্দ্রিয়গুলি দুর্ব্বল বলিয়া কামনা আরও বৃদ্ধি পায়। দুর্ব্বল জীবের কামপ্রবৃত্তি অত্যন্ত প্রবলা। দুর্ব্বলের ক্রোধও বেশী এবং শীঘ্র হয়। দুর্ব্বলই ধূর্ত্ত এবং শঠ হয়, দুর্ব্বলই বঞ্চক হয়, যতগুলি দোষ সকলগুলিই দুর্ব্বল ব্যক্তিতে প্রকট। দুর্ব্বলতাই পাপের আকর, অথবা দুর্ব্বলতাই

পাপ। দুর্ব্বলতা ও সবলতা চিত্তের বৃত্তি। ধর্ম্মাধর্ম্ম, জ্ঞান অজ্ঞান, ঐশ্বর্য্য অনৈশ্বর্য্য, বৈরাগ্য অবৈরাগ্য এইগুলিও চিত্তের বৃত্তি। বিবেচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অনৈশ্বর্য্য ও অবৈরাগ্যের মূল দুর্ব্বলতা, এবং জ্ঞান, ধর্ম্ম, ঐশ্বর্য্য, বৈরাগ্য প্রভৃতির মূল সবলতা। আরও সূক্ষ্মতর ভাবে বিচার করিলে দেখা যাইবে, একমাত্র সবলতাই জ্ঞান, তাহাই উপসেব্য।

"শব্দায়তে শূন্যপাত্রমধিকং নতু পূরিতম্।" দুর্ব্বলেরই আস্ফালন বেশী। বৃহৎ বলশালী মৎস্য জলের নিম্নে অবস্থান করে, আর স্বল্পবল মৎস্যগণই জলের উপরে বিচরণ করে। শক্তিমানের পক্ষেই সংযম, ক্ষমা, প্রেম, দয়া, সত্য, সরলতা, নির্ভীকতা প্রভৃতি সম্ভব। দুর্ব্বলের সংযম অসম্ভব, যাহার শক্তি নাই, সে সংযত হইতে পারে না। দুর্ব্বল ক্ষমা করিতেও পারে না, যাহার বল নাই সে ক্ষমা করিবে কি প্রকারে? অক্ষমের আবার ক্ষমা কি? অক্ষমের ক্ষমা তামসিকতা। অক্ষম মনে মনে যন্ত্রণা ভোগ করিয়া বাহিরে ক্ষমার ভাব দেখাইতে চাহে, তাহা প্রকৃত ক্ষমা নহে।

"সহনং সর্ব্বদুঃখানামপ্রতিকারপূর্ব্বকং চিন্তা-বিলাপরহিতং সা তিতিক্ষা নিগদ্যতে।" প্রতিকারের

চেষ্টা না করিয়া, চিন্তা ও বিলাপ পরিত্যাগ করিয়া সকল দুঃখ সহিয়া যাওয়াই তিতিক্ষা বা সহনশীলতা। ইহাই প্রকৃত ক্ষমা, ক্ষমা বলবানের ধর্ম্ম, দুর্ব্বল প্রতিহিংসাপরায়ণ। প্রেম সবলের ধর্ম্ম, প্রেমে আকাঙ্ক্ষা নাই, অপরিতৃপ্তি নাই, তাহা স্বচ্ছ এবং সবল। দুর্ব্বলের প্রেম প্রেম নহে, উহা জঘন্য ইন্দ্রিয়-লালসা। প্রেমের স্বরূপ সবলতা, প্রেমের অবস্থান সবলতা, প্রেমে কামগন্ধ নাই, প্রেম সরস, প্রেমে বিকলতা নাই, প্রেম স্থির। প্রেমে চাঞ্চল্য নাই, প্রেম ধীর, প্রেমে অভাব নাই, প্রেম পরিপূর্ণ। দুর্ব্বলের পক্ষে তাই প্রেম অসম্ভব।

দয়া বলবানের ধর্ম্ম, দুর্ব্বলের নহে। দুর্ব্বল ব্যক্তি সর্ব্বদা ভয়ে কাতর, সত্য বলিবার বা আচরণ করিবার সাহস তাহার নাই; সর্ব্বদাই যে ব্যক্তি সন্ত্রস্ত তাহার পক্ষে সত্যনিষ্ঠ হওয়া একপ্রকার অসম্ভব। সত্য না থাকিলে সবলতা থাকিতে পারে না। উহারা যেন যমজ ভাই ভগ্নি, সত্য থাকিলেই সবলতা থাকে এবং সবলতা থাকিলেই সত্য থাকে। দুর্ব্বল সর্ব্বদাই ভয়ে ত্রস্ত, তাই তাহার অভয় থাকিতে পারে না। দুর্ব্বলতা পাপ বলিয়া দুর্ব্বল ব্যক্তি পাপপরায়ণ হয়। দুর্ব্বল

ব্যক্তি প্রকৃতি হইতে দুর্ব্বলতা গ্রহণ করিতেছে, সংসারেও দুর্ব্বলতা পাপকে আশ্রয় করিতেছে। তবে যে দুর্ব্বল ব্যক্তির মাঝে মাঝে কখনও, কদাচিৎ সবলতা দেখা যায়, তাহার কারণ চিত্তবৃত্তিতে সবলতা লুক্কায়িত আছে, কখনও হঠাৎ প্রকাশিত হয়। ক্লিষ্ট বৃত্তি ও অক্লিষ্ট বৃত্তি উভয়ই চিত্তক্ষেত্রে নিহিত, কখনও ক্লিষ্টের ছিদ্রে অক্লিষ্টের প্রবেশ হয়; আবার কখনও অক্লিষ্টের ছিদ্রে ক্লিষ্ট প্রবেশ করে। তপস্যানিমগ্ন বিশ্বামিত্রের মেনকাদর্শনে কামোদ্রেক অক্লিষ্টছিদ্রে ক্লিষ্টের প্রবেশের দৃষ্টান্ত। আবার অনেক সময় কুচিন্তার অন্তরালে সুচিন্তা আসিয়া উপস্থিত হয়,—"পাগল করেছে মোরে ঐ দুটো আঁখি"—এই গান রঙ্গালয়ে শুনিয়া ভগবানকে মনে হয়। "বেলা যায়" শব্দ শুনিয়া সংসারাসক্ত লালা বাবুর নির্ব্বেদ উপস্থিত হওয়া ক্লিষ্ট ছিদ্রে অক্লিষ্টের প্রবেশ। পাতঞ্জল-যোগসূত্রের ভাষ্যে ভগবান্ ব্যাসদেব লিখিয়াছেন,—ক্লিষ্টপ্রবাহপতিতা অপি অক্লিষ্টাঃ ক্লিষ্টছিদ্রেষু অপি অক্লিষ্টা ভবন্তি, অক্লিষ্টছিদ্রেষু ক্লিষ্টা ইতি (যোঃ সূঃ সাঃ পাঃ ৫ম সূঃ)

দ্বিতীয় অধ্যায়

বলের উৎস।

মানবের চিত্তক্ষেত্রে উভয় বীজই সুপ্ত অবস্থায় থাকে—সবলতার বীজ অক্লিষ্ট বৃত্তি এবং দুর্বলতার বীজ ক্লিষ্ট বৃত্তি। সংস্কার হইতে বৃত্তি এবং বৃত্তি হইতে সংস্কার, এইরূপ অনাদি প্রবাহ চলিতেছে। মানবের চিত্তে প্রাকৃতিক নিয়মে উভয়বিধ সংস্কার থাকায় যে বৃত্তির উৎকর্ষ সাধিত হয়, তদনুকূল সংস্কার দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইতে থাকে। পাশ্চাত্য দর্শনের Blank Tablet (Tabula Rasa) বা নির্বৃত্তিক চিত্ত আদপেই গ্রাহ্য হইতে পারে না। ইংরেজ দার্শনিক Lockeএর "All ideas proceed from Experience" কথাটির মূল্য কতদূর তাহাও বিশেষ বিবেচনা করিতে হইবে। প্রথমতঃ চিত্ত নির্বৃত্তিক, ইহা সাধারণ অবস্থায় কখনই সম্ভব নহে; কারণ বালকের নানারূপ বৃত্তি-ভেদ দেখা যায়। বালক সকল জিনিষই Experience হইতে শিখে, এ কথা আদপেই বলা যায় না। বানরের সন্তানোৎপত্তির সময়ে বানরশিশু মাতৃগর্ভ

হইতে বাহির হইতে না হইতে বৃক্ষের শাখা ধরিয়া ফেলে এবং মা সরিয়া যায়, তাহাতে বানরশিশু গর্ভ হইতে বহির্গত হয়। এই সংস্কার তাহার চিত্তক্ষেত্রে অবশ্যই আছে। কোনও বালক অতি শৈশবে নানারূপ দুষ্ট প্রকৃতির পরিচয় দেয়; মরণত্রাস বালকেরও লক্ষিত হয়; বালক মাতৃস্তন্য পানের জন্য লালায়িত হয় কেন? ক্ষুধা তৃষ্ণা বোধ বালকেরও আছে, আঘাতের যন্ত্রণায় বালক কাঁদে; মিষ্ট ও তিক্ত জিনিষের পার্থক্য বুঝিতে পারে কেন? যদি মানবের চিত্ত Tabula Rasa বলিয়া গৃহীত হয় এবং সকল ধারণাই (ideas) যদি ভূয়োদর্শনের অভিজ্ঞতার (Experience) ফলে হয় তাহা হইলে বালক জন্মমাত্র কাঁদে কেন? মায়ের নিকট থাকিলে সুস্থ থাকে কেন? Intuition বলিয়া আবার নূতন জিনিষ স্বীকার করিবার আবশ্যকতাই বা কি? কীটের ভিতরেও মরণত্রাস দেখিতে পাওয়া যায়। মশক প্রভৃতি জন্মিতেছে, মরিতেছে, তাহাদেরও মরণত্রাস দেখিতে পাই; যদি চিত্তবৃত্তি শূন্যই হইবে তাহা হইলে তাহাদের মরণভয় কেন? জীবের আমি বোধই বা কেন? কোন কোন বৃক্ষকে আঘাত করিলে সঙ্কুচিত হয় কেন? বৃক্ষগুলি সূর্য্যের দিকেই

বা বৰ্দ্ধিত হয় কেন? পাতঞ্জল দর্শনে,—"স্বরসবাহী বিদুষোঽপি তথারূঢ়োঽভিনিবেশঃ" মরণত্রাস সকলেরই আছে, ইহাতে পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সংস্কার প্রতিপন্ন হইতেছে।

শিশুরও সংস্কার আছে, অতএব Mind is a Tabula Rasa অথবা সংস্কারশূন্য মন ইহা হইতেই পারে না। বহিঃপ্রকৃতি হইতে ভূয়োদর্শনের ফলে ধারণার উন্মেষ হয় বা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এই মাত্র। কিন্তু সকল ধারণাই (idea) ভূয়োদর্শন হইতে উৎপন্ন ইহা আদপেই গ্রাহ্য নহে। নির্ম্মল যোগীর চিত্তে ভূয়োদর্শনের স্পৃহা নাই। পরন্তু তিনি সমস্ত বাহিরের প্রকৃতি হইতে নিজের চিত্তকে অন্তর্নিবিষ্ট করিলেও তাহার চিত্তে কিন্তু সমস্ত বিষয়ের জ্ঞানই সুপরিস্ফুট। তাঁহাকে Experience এর জন্য মাথা ঘামাইতে হয় না।

কোনও গৃহের দরজা অনেকে মিলিয়া খুলিতে হয়, কিন্তু গৃহে আগুন লাগিলে সামান্য শক্তিসম্পন্না স্ত্রীলোকও তাহা অনায়াসে খুলিয়া বাহির হয়। এই শক্তি কি সে বাহির হইতে পাইল, না, তাহার অন্তর্নিহিত ছিল? বলিতে হইবে তাহার অন্তর্নিহিতই ছিল। কেবল বাহ্যপ্রকৃতি তাহার সুযোগ করিয়া

দিয়াছে। বিপদে পড়িয়া লোকে অসাধ্য সাধন করে। এই শক্তি কোথা হইতে পায়? অবশ্যই বলিতে হইবে, তাহার অন্তর্নিহিত ছিল, কেবল প্রকাশের উপযোগী সুবিধায় প্রকাশিত হইল এই মাত্র।

বেদে বামদেবঋষির জ্ঞানের বিষয় উল্লিখিত আছে। তিনি মাতৃগর্ভে থাকিতেই জ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন। কপিলদেব জ্ঞানসম্পন্ন অবস্থায়ই জন্মিয়াছিলেন। ইঁহাদের জ্ঞানে Experience (অভিজ্ঞতা) এর কোনও আবশ্যকতাই দেখা যায় না। যদি Experience বা culture দ্বারাই সকল সম্পন্ন হয়, তাহা হইলে একই শিক্ষকের নিকট শিক্ষিত সকলেই সমান হইত। চিত্তবৃত্তির সবলতা ও দুর্ব্বলতার দ্বারা কোনও রূপ পার্থক্য হইত না। তবে যে দেশের আবহাওয়া এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থাদ্বারা মনের বিভিন্নতা হয় তাহার কারণ এই যে বহিঃপ্রকৃতির সহিত অন্তঃপ্রকৃতির সংযোগ আছে। মূলতঃ বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতি একই। বহিঃপ্রকৃতি যেমন দেশভেদে, কালভেদে, পারিপার্শ্বিক অবস্থাভেদে বিভিন্ন হয়, সেইরূপ মনও দেশভেদে, কালভেদে এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা ভেদে বিভিন্ন হয়। কিন্তু মূল মনের কোনও বিভিন্নতা

লক্ষিত হয় না। বাহিরের প্রকাশ সম্বন্ধেই বিভিন্নতা। সত্ত্বগুণাশ্রিত মনের প্রকাশ অধিক। রজোগুণাশ্রিত মনের চঞ্চলতা অধিক এবং তমোগুণাশ্রিত মন মোহমুগ্ধ বা একপ্রকার অপ্রকাশ। কিন্তু তাই বলিয়া মনের মূলতঃ কোনও বিভিন্নতা নাই, কেবল প্রকাশের পার্থক্য। মনের ভিতর সকলই প্রচ্ছন্ন থাকে, কেবল বাহিরের প্রকৃতির সহযোগে প্রকাশিত হয় মাত্র। Experience বা ভূয়োদর্শন সাহায্যকারীর অন্যতম, এই মাত্র বলা যাইতে পারে।

অনেক মেধাবী বালক অল্প চেষ্টায় পাঠ শিখিয়া ফেলে, অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন বালককে সহস্রবারেও বুঝান যায় না। ইহাদ্বারাও প্রতিপন্ন হয় যে, Eeperience এর ফলেই Idea বা ধারণা হয় না। Idea বা ধারণা ভিতরের জিনিষ, উহা বাহ্যপ্রকৃতি হইতে সাহায্য পায় মাত্র। উহা কিন্তু অন্তর্নিহিত জিনিষ, কেবল একটু ধাক্কা পাইয়া উন্মেষিত হয় এই মাত্র। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য পঞ্চম বৎসরে পাঠ সমাপন করিয়াছিলেন, অষ্টম বৎসরে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন; তাঁহাকে হয় ত prodigy বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইব, এবং পঞ্চম বৎসর বা অষ্টম বৎসরে পাঠ সমাপন ও

সন্ন্যাস অসম্ভব বলিব, কিন্তু ষোড়শ বৎসরের ভিতরে বেদান্ত-দর্শনের ভাষ্যাদি প্রণয়ন কি Experience বা ভূয়োদর্শনের ফল? ষড়দর্শনের টীকাকার বাচস্পতি মিশ্রের সম্বন্ধে একটী উপাখ্যান প্রচলিত আছে। তিনি যখন শারীরক ভাষ্যের ভামতী টীকা লিখিতেছিলেন, তখন হঠাৎ একদিন প্রদীপ নিভিয়া যায়, তাঁহার স্ত্রী আসিয়া তখন প্রদীপ জালাইয়া দিলেন। ঐ সময়ে বাচস্পতি এমন তন্ময় ছিলেন যে, নিজের স্ত্রীকে চিনিতে পারিলেন না। যখন জিজ্ঞাসায় জানিতে পারিলেন যে স্ত্রী; তখন বুঝিলেন, স্ত্রী সর্ব্বদাই এরূপভাবে সেবা করিতেছেন। তিনি প্রসন্ন হইয়া প্রশ্ন করিলেন—তুমি কি চাও? স্ত্রী উত্তর কবিলেন,—"স্ত্রালোকের অন্য প্রার্থনীয় কিছুই নাই—আশীর্ব্বাদ করুন যেন আপনার অগ্রে মরিতে পারি।" তখন মিশ্র মহোদয় বলিলেন, "তোমাকে অমর করিয়া যাইব"। তিনি স্ত্রীর নামানুসারে টীকার নাম "ভামতী" রাখিলেন। এই উপাখ্যানে তাঁহার তন্ময়ত্বই প্রমাণিত হয়। বাহিরের প্রকৃতি হইতে বিচ্ছিন্ন ভাবেই যেন ধ্যানমগ্ন তপস্যায় রত থাকিয়া টীকাদি প্রণয়ন করিয়াছিলেন, ইহাই অনুমিত হয়। ঋষিগণ ধ্যানবলেই অতীন্দ্রিয় বস্তু সাক্ষাৎ করিয়া নিগূঢ় সত্যাবিষ্কার করিতেন। বহিঃপ্রকৃতি

হইতে মনকে বিছিন্ন করিয়াই নিগূঢ় সত্য প্রকট করিতে পারিয়াছিলেন। পশু পক্ষীও স্বাভাবিক ভাবে কতকগুলি বৃত্তি বা ধারণা পায়। ইহার জন্য তাহাদের কোনরূপ ভূয়োদর্শনের আবশ্যকতা দেখা যায় না।

বুদ্ধদেবের চিত্তক্ষেত্রে জ্ঞান ও বৈরাগ্যের বীজ লুক্কায়িত ছিল। কেবল বাহিরের দৃশ্য তাঁহার সাহায্য করিয়াছিল ইহাই মনে হয়। বুদ্ধদেবের সাধনা, যীশুর সাধনা, এবং মহম্মদের সাধনার মূলেও অন্তর্নিহিত শক্তির উদ্বোধন ব্যতীত অন্য কিছুই মনে হয় না। অতএব Experience বা ভূয়োদর্শনের ফলে সকল idea বা ধারণা উৎপন্ন হয়, একথা সর্ব্ববাদি-সম্মত হইতে পারে না। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সত্যগুলি আবিষ্কার কেবল Experience বা ভূয়োদর্শনের বলেই হইয়াছে, একথা সর্ব্বত্র শুনিতে পাই। এসম্বন্ধে দু'একটী বিষয় বিবেচনা করিবার আছে—প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সত্যগুলি অনেক পরিমাণে অনুমান প্রমাণের উপর নির্ভর করে। Galileo প্রভৃতির সিদ্ধান্ত অনুমানের বলেই সুসিদ্ধ। অনুমান কেবল ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার নহে, উহাতে মনের ব্যাপারই বিশেষ ভাবে প্রকট। ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞান মাত্র নির্ব্বিকল্পক বা সম্মুগ্ধ।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সত্যগুলি কেবল প্রত্যক্ষ প্রমাণের বা ঐন্দ্রিয়িক প্রমাণের বলেই সিদ্ধ হয় না। "চলা পৃথ্বী স্থিরা ভাতি", Earth is moving ইহা প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধ। সূর্য্য স্থির ইহা প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধ কিন্তু জাগতিক শক্তির অনুবলেই অনুমান প্রমাণে সূর্য্যের স্থিরত্ব এবং পৃথিবীর গতি অনুমিত হইতেছে। অনুমান জ্ঞানে ব্যাপ্তি জ্ঞানের আবশ্যকতা এবং পরামর্শ জন্যই অনুমান জ্ঞান হয়। ইহা প্রকৃত প্রস্তাবে অনেকটা মানসিক; এবং প্রত্যক্ষ ও মানস ইন্দ্রিয়গুলি কেবল দ্বারের মত। ঘরের ভিতরে ঘড়ি বাজিতেছে, কোনও ব্যক্তি অধ্যয়নে নিমগ্ন, ঐ ব্যক্তি ঘড়ির শব্দ শুনিতে পাইতেছে না কেন? কারণ সে অন্যমনস্ক। বালক খেলায় মগ্ন, তাহার কোনও অঙ্গে আঘাত লাগিয়াছে, রক্ত পড়িতেছে, কোনও বেদনার বোধ তাহার নাই, এখানেও অন্যমনস্ক ছিল বলিয়াই তাহার বেদনার বোধ হয় নাই। প্রত্যক্ষেও মনই গ্রহণ করিতেছে। মনের অন্তর্নিহিত শক্তিতেই মন গ্রহণ করিতে পারে, বাহ্যপ্রকৃতি হইতে সাহায্য পায় মাত্র। ইহা আমরা পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন করিয়াছি। সত্য জিনিষটা আপনিই প্রকাশিত হয়, কারণ উহার সপ্রকাশতা আছে। মন আবরণ দূর করে, তাহাতেই

স্বপ্রকাশ সত্যটী আবির্ভূত হয়। সত্যটী অন্তরেই নিহিত। বাহিরে যে সত্যটী প্রকট, তাহাও আমরা অন্তর্জগতেই বুঝিতে পারি।

চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ যে অনেক স্থলেই ভ্রমাত্মক তাহা পৃথিবীর চলনত্ব ও সূর্য্যের স্থিরত্বে দেখিয়াছি। দিগ্‌ভ্রমেও দেখিতে পাই নৌকা চলিতেছে, অথচ দেখা যায় তীর ও বৃক্ষ চলিতেছে; অতএব ঐন্দ্রিয়িক প্রত্যক্ষ প্রকৃত প্রস্তাবে প্রত্যক্ষ বলা যাইতে পারে না। অন্তঃকরণই বিষয় গ্রহণ করিতেছে। অতএব প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সত্যগুলি কেবল Experience বা Experiment দ্বারা হইতেছে ইহা বলা চলে না। উহারা সাহায্যকারী মাত্র। *

* অসীম বা অনন্তের জ্ঞান কখনই Experience দ্বারা হইতে পারে না। আর যদি Experience অর্থ Impression হয়, তাহা হইলেও শুধু ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞানই বুঝায়। ইহার অতিরিক্ত কিছুই নহে। পাশ্চাত্য দার্শনিক Kantও Experience মত খণ্ডন করিয়াছেন। তাঁহার মতে "The principles of Demonstration by which we obtain our results when dealing with the forms of intuition and the categories are inapplicable to the realm of ideas.

মনস্তত্ত্বের আর একটি বিষয় ভাবিবার আছে— প্রকৃতিতে যাহা সৌন্দর্য্য এবং ভাবগাম্ভীর্য্য তাহা Experience গ্রাহ্য নহে। মধুর সঙ্গীতের মাধুর্য্য কেমন এক অব্যক্তভাবে চিত্তাকর্ষক হয়। সমুদ্রের অতল গাম্ভীর্য্য, পর্ব্বতের নীরব গাম্ভীর্য্য আপনা হইতেই যেন চিত্তে এক অভিনব ভাবের সঞ্চার করে। তাহার জন্য আমাদের কোন চেষ্টা করিতে হয় না।

এই আলোচনা হইতে আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয়ের অনেক সূক্ষ্ম ধারণা প্রকটিত হইল। সবলতা ও দুর্ব্বলতা মানসিক বৃত্তি, সংস্কার মূলে থাকাতেই উভয়বিধ বৃত্তির ক্রিয়া দেখিতে পাই। অন্তরের লুকায়িত শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে। পাশ্চাত্য দার্শনিক বলিবেন,

---

The ideas demand an unconditionality, a totality, finality, but experience, which is always limited, never furnishes any such thing. Neither God nor the soul (as substance), nor the universe (as an absolute whole) can be given in experience. There is no possibility of an objective deduction. It is impossible to construct a science of ideas"

(Hoffding's History of Philosophy.)

বাহিরের ভূয়োদর্শনেই শক্তির উৎপত্তি হইবে। আমরা কিন্তু ইহার সার্থকতা দেখিতে পাই না, বরং আমরা প্রতিপন্ন করিতে চাই যে অন্তর্নিহিত শক্তিই বিকশিত হয়, এই মাত্র।

সবল লোক বাহিরের প্রকৃতিতে সবলতাই দেখিতে পায়; এবং দুর্ব্বল লোক দুর্ব্বলতাই দেখে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। প্রকৃতি সমান থাকিলেও মানবীয় প্রকৃতির বৈষম্য হেতু এই বিভিন্নতা পরিদৃষ্ট হয়। অতএব বলিতে হইবে অন্তরের প্রকৃতিই নিজকে প্রকটিত করে। বাহিরের প্রকৃতি হইতে স্থূলভাব গ্রহণ করিয়া পুষ্ট হইয়া আমাদের নিকট প্রতিভাত হয়, এই মাত্র। পিতৃশক্তি মাতার উপাদানে পরিপুষ্ট হইয়া সন্তানরূপে আবির্ভূত হয়। বীজের অন্তর্নিহিত শক্তিই প্রকৃতি হইতে রস গ্রহণ করিয়া বিকশিত হয়, কারণ বীজের বীজশক্তি নষ্ট হইলে শত চেষ্টায়ও তাহা হইতে বৃক্ষ উৎপাদিত করা যায় না। ফুল আপনার শক্তিতেই ফোটে, কেবল মাত্র বাহিরের শিশির বিন্দু সাহায্য করে, যোগীর কুলকুণ্ডলিনী সাধনও অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ; উহা ধার করা জিনিষ নহে, উহা নিজস্ব, উহা ঘসিয়া মাজিয়া সংস্কার করিতে হয় না, কেবল আবরণ দূর

করিতে হয়। সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণগুলি অনাদি; একটী অন্যটী দ্বারা অভিভূত হইয়া থাকে, এই মাত্র।

তৃতীয় অধ্যায়

সবলতার সাধনা।

বল বৃদ্ধির উপায় সম্বন্ধে পতঞ্জলি যোগদর্শনে যাহা বলিয়াছেন, তাহা প্রণিধানের যোগ্য। বাস্তবিক বল বিধানের হেতু মন। এজন্যই Sandowর Dumbbells করিবার সময় মনের স্থৈর্য্য মাংসপেশীতে সংবদ্ধ করিতে উপদেশ দেওয়া হয়। বল ভিতরের, বাহিরের উপায় দ্বারা উহা প্রকাশ করিতে হয়। মনের সংযমে সকল প্রকার বল লাভ হইতে পারে, ইহাই পাতঞ্জল দর্শনে প্রতিপন্ন হইয়াছে। রোগীর মন দুর্ব্বল হইলে শত ঔষধেও তাহার কিছু হইতে চাহে না, ইহা সর্ব্বজন-প্রত্যক্ষ। বাস্তবিক বলের উৎস ভিতরে, বাহিরে নহে;

তবে বাহির হইতে সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। পতঞ্জলি শারীরিক শক্তি বাড়াইবার জন্য লিখিয়াছেন,—

"বলেষু হস্তি বলাদীনি"—(পাঃ দর্শন ৩।২৪),

ইহার ভাষ্যে ব্যাসদেব লিখিয়াছেন—

"হস্তিবলে সংযমাদ্ হস্তিবলো ভবতি"।

সংযম অর্থ,—ধারণা, ধ্যান, সমাধি। সংযম মানসিক, উহা বাহিরের নহে। হস্তীবলের কার্য্যগুলি প্রথমে ধারণা করিয়া উত্তরোত্তর সূক্ষ্ম ধারণা করিতে করিতে নিজের বল বৃদ্ধি হইবে। শ্রুতির বাক্যটীও এই সিদ্ধান্তের অনুকূল। "তং যথা যথোপাসতে স তথৈবভবতি।" ভগবানও গীতায় বলিয়াছেন, "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।" ৪।১১॥

সাধনার আবশ্যকতা অবশ্যই আছে, কেবল আবরণ দূর করাই সাধনার তাৎপর্য্য। যে বস্তু স্বপ্রকাশ, তাহাকে প্রকাশ করিতে অন্য কোনও সাধনার আবশ্যকতা নাই। সূর্য্যকে প্রকাশ করিতে অন্য প্রদীপের প্রয়োজন নাই; কেবল মেঘ অপসারিত হইলেই হইল। তেমনই আবরণ অপসারিত হইলে চিৎপ্রকাশ অন্তঃপ্রকৃতি বাহ্যপ্রকৃতির নিরপেক্ষতায় ফুটিয়া উঠিতে পারে—যোগীই ইহার দৃষ্টান্ত। যোগী বাহ্যপ্রকৃতি হইতে অন্তরের

প্রকৃতিকে বিমুক্ত করিয়া অন্তর-দর্পণে সূক্ষ্মতম কালেরও সত্তা উপলব্ধি করিতে পারেন। অতীত, অনাগত সকল বিষয়েরই জ্ঞান তাঁহার হইতে পারে।

"পরিণামত্রয়সংযমাদতীতানাগতজ্ঞানম্।"

(পাঃ দর্শন ৩।১৬)

সর্ব্ব-সাধন-সম্পন্ন যোগী ধর্ম্ম, লক্ষণ ও অবস্থার পরিণামে সংযম করিলে অতীত এবং অনাগত বিষয়ের জ্ঞান লাভ করেন। নির্ম্মলচিত্ত যোগীর নিকট সর্ব্ব-ভূতের শব্দ বোধগম্য। "শব্দার্থপ্রত্যয়ানামিতরেতরাধ্যাসাৎ সঙ্করস্তৎপ্রবিভাগসংযমাৎ সর্ব্বভূতরুত-জ্ঞানম্" (পাঃ দঃ ৩।১৭)। মানবীয় সংস্কারসমূহে সংযম করিলে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মান্তরসমূহের জ্ঞান লাভ হয়। "সংস্কার সাক্ষাৎকরণাৎ পূর্ব্বজাতিজ্ঞানম্" (৩।১৮)

যোগী নিজের চিত্তবৃত্তি (প্রত্যয়সমূহে) সংযম পূর্ব্বক অন্যের চিত্তের প্রত্যয়সমূহও বুঝিতে পারেন। "প্রত্যয়স্য পরচিত্তজ্ঞানম্" (পাঃ দঃ ৩।১৯)। যোগী হৃদয়ে—বিশুদ্ধ ভাস্বর আকাশ-কল্প বুদ্ধিসত্ত্বাতে সংযম করিলে অতি সূক্ষ্ম বস্তু—যাহা চক্ষু প্রভৃতির গ্রাহ্য নহে,—তাহাও জানিতে পারেন। বাধার অন্তরালের বস্তুও জানিতে পারেন, অতি দূরের বস্তুরও জ্ঞান হয়। সূর্য্যে

সংযম করিলে সমস্ত বিশ্বের জ্ঞান হয়। "ভুবনজ্ঞানং সূর্য্যে সংযমাৎ" (পাঃ দঃ ৩।২৬)। চন্দ্রে সংযম করিলে সমস্ত নক্ষত্রমণ্ডলের জ্ঞান হয়। "চন্দ্রে তারাব্যূহ জ্ঞানম্" (পাঃ ৩।২৭)। ধ্রুব নক্ষত্রে সংযম করিলে তারা সমূহের গতির জ্ঞান হয়। "ধ্রুবে তদ্‌গতিজ্ঞানম্" (৩।২৮)।

বর্ত্তমান বিজ্ঞানের Thought Reading, Hypnotism (সম্মোহন বিদ্যা), Ventriloquism প্রভৃতিও ইহার সার্থকতাই প্রতিপন্ন করিতেছে। অতএব বাহ্য-প্রকৃতি মন গঠনের মুখ্য কারণ নহে, পরন্তু গৌণ কারণ। অন্তঃপ্রকৃতির বিকাশে বাহ্যপ্রকৃতি সামান্যরূপে সাহায্য করিতে পারে; কিন্তু অন্তঃপ্রকৃতি আপনার সত্তায় বিকশিত হইবার জন্য উন্মুখ হয়। তাহাতেই বাহ্যপ্রকৃতির যৎসামান্য সাহায্যের আবশ্যকতা। দার্শনিক Rousseauএর 'Nature' বোধহয় অনেকটা পরিমাণে অন্তর্জ্জগতের বা অন্তঃপ্রকৃতির উপরেই নির্ভর করিতেছে।* তাঁহার মতে জীবনের সমষ্টি-

* "Nature consists of the immediate, total energy of life, spontaneous development, rather than the restraint and complexity which civilization so readily brings with it. Man has a natural

শক্তিই প্রকৃতি। ইহার বিকাশ স্বতঃপ্রবৃত্ত। মানব স্বাভাবিকভাবেই আপনার বৃত্তিগুলি বিকশিত করে; ভিতরের শক্তি অনন্ত, সেই শক্তি সর্ব্বজীবে পরিব্যাপ্ত। সেই অনন্ত শক্তিই ব্যক্তিবিশেষের হৃদয়ে ক্রিয়া করে। স্বাভাবিক প্রবণতা সমধিক বলিয়াই—জীবনের অব্যক্ত মূল সূত্র অনন্ত বলিয়াই, মানব আত্মপ্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়।

একটী বিষয় আমরা আরও অনুধাবন করিব, সে বিষয়টী স্বপ্ন। স্বপ্নাবস্থায় বাহিরের প্রকৃতির সহিত

tendency to assert himself, to develop aptitudes and impulses. And the spontaneous tendency is so Powerful, the hidden source of life is so rich, that self-assertion in itself in no wise contradicts sympathy, or resignation and self-denial. *** The stream which issues from within extends to all beings which are similarly constituted to the individual himself. *La force d' une ame expansive midentific over mon sem blable"*—

Hoffding's His. of Phi—
C. F. Sanders. Ed. 1912 P. 125.

যোগ না থাকিলেও মনই দ্রষ্টারূপে, আবার কখনও দৃশ্যরূপে নানা মূর্ত্তি হইতেছে। বাহ্যপ্রকৃতির সহিত যোগ নাই, কিন্তু স্বপ্নাবস্থায় জ্ঞান আছে। চিত্তের শোক হর্ষাদি বৃত্তি সকলও প্রকটিত। দান, ধ্যান, শিক্ষা, দীক্ষা প্রভৃতি ব্যাপারও আছে; কিন্তু ইন্দ্রিয়গুলি সুপ্ত, তথাপি ইন্দ্রিয়বিষয়ক জ্ঞানগুলি মনে হইতেছে। মনই দ্রষ্টা, মনই দৃশ্য। অতএব বাহিরের প্রকৃতি মনেই। বাহিরের প্রকৃতিকে Self-projection বলিতে পারি। সূর্য্যরশ্মি যেমন স্বপ্রকাশ, কিন্তু জড় বস্তুসমূহকে প্রকাশ করিয়া আপনিও প্রকাশিত, সেইরূপ বাহ্যপ্রকৃতিও চিৎ-প্রকাশিত। এখন প্রশ্ন হইবে বাহ্য ও অন্তঃপ্রকৃতির সম্বন্ধটী কি? প্রকাশ্য ও প্রকাশক? যদি বলি বাহ্য-প্রকৃতি অন্তঃপ্রকৃতির প্রকাশ্য, তাহা হইলে অন্তঃ-প্রকৃতির বৃত্তিগুলি বাহ্যপ্রকৃতির বলে প্রকাশিত হয় কেন? যথা দয়া—কোন দয়ার্ বিষয় বাহির হইতে আসিলেই দয়ার বৃত্তি প্রকাশিত হয়। এ ক্ষেত্রে দেখিতে পাই, বাহ্যপ্রকৃতি অন্তঃপ্রকৃতির প্রকাশক। বাস্তবিক পক্ষে বাহ্যপ্রকৃতি প্রকাশক নহে, উদ্বোধক মাত্র। বাহ্যপ্রকৃতির সাহায্যে অন্তঃপ্রকৃতি নিজের সত্তায় উদ্বুদ্ধ হইল। রোগের বীজ ভিতরেই নিবদ্ধ; কেবল বাহির

হইতে উহার উদ্বোধক কারণরূপে বহিঃপ্রকৃতির সাহায্য আবশ্যক। দুর্গাপূজায় দেবীর 'উদ্বোধন' 'আমন্ত্রণ' 'অধিবাস' প্রভৃতিও অন্তর্নিহিত শক্তির উদ্বোধন ব্যতীত আর কিছুই নহে। হরির উত্থান, শয়ন প্রভৃতিও অন্তর শক্তির সুপ্তভাব ও উদ্বোধনেরই জ্ঞাপক। ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞান বা Sense perceptionএর অর্থই,—বাহ্যপ্রকৃতি-গ্রাহ্য, এবং ইন্দ্রিয়গুলির সাহায্যে মন তাহার গ্রাহক। যেমন কোনও সৌধ প্রস্তুত করিতে হইলে মনে মনে তাহার নক্সা (Plan) অঙ্কিত করি, শেষে সৌধটী নানারূপ মালমশলা দিয়া নির্ম্মাণ করি। অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতির ব্যাপারও অনেকটা সেইরূপ। "প্রত্যক্ষ" অর্থেও বুঝিতে পারি অন্তঃপ্রকৃতিই বাহ্যপ্রকৃতিকে প্রকাশ করিতেছে। আমিই বাহ্যপ্রকৃতির জ্ঞাতা, বাহ্য-প্রকৃতির অন্তরালে এবং আমার অন্তরে একই বস্তু দ্রষ্টারূপে অবস্থিত। শ্রুতি এই কথা অতি স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন, "যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো, যং পৃথিবী ন বেদ যস্য পৃথিবী শরীরং যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্য্যাম্যমৃতঃ" (বৃহ, ৩।৭।৩)।

অর্থাৎ যিনি পৃথিবীতে থাকিয়াও পৃথিবী হইতে অন্তর, যাঁহাকে পৃথিবী জানে না এবং পৃথিবী যাঁহার

শরীর, যিনি পৃথিবীর অভ্যন্তরে থাকিয়া পৃথিবীকে নিয়মিত করেন, তিনিই তোমার সেই অমরণধর্ম্মা আত্মা।

বাহ্যপ্রকৃতির ও অন্তঃপ্রকৃতির অন্তরালে এক অন্তর্য্যামী, এক আত্মা, এক অমৃতস্বরূপ ব্রহ্মই প্রকাশক। আত্মাই ব্রহ্ম, অতএব আমিই প্রকাশক। অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন আমি জগতকে প্রকাশ করিতেছি। প্রমাণ প্রমেয় প্রভৃতিই জগৎ। আর আমিই প্রমাতা। প্রমাতাই প্রমাণ প্রমেয় ব্যবহার নিষ্পন্ন করে। অতএব আমিই জগতের প্রকাশক ও গ্রাহক। অতএব আন্তর প্রকৃতিই জগতের প্রকাশক। ন্যায়দর্শনে প্রত্যক্ষের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতে বলিয়াছেন,—"ইন্দ্রিয়জন্যং প্রত্যক্ষম্," বাহ্যবস্তুই প্রত্যক্ষের বিষয়, এবং ইন্দ্রিয়ই প্রত্যক্ষের কারণ। "জ্ঞানাকরণকং জ্ঞানং প্রত্যক্ষম্" এই লক্ষণদ্বারাও বাহ্যপ্রকৃতি আন্তরপ্রকৃতির প্রকাশ্য—ইহাই প্রতিপন্ন হয়। বেদান্ত-দর্শনের প্রত্যক্ষের লক্ষণ, আরও সুন্দররূপেই ইহা প্রতিপন্ন করে। "প্রমাণচৈতন্যেন সহ বিষয়চৈতন্যস্যাভেদঃ" প্রমাণ-চৈতন্যের সহিত বিষয়চৈতন্যের অভেদই প্রত্যক্ষ। বাস্তবিক আত্মাই অন্তরে ও বাহিরে। পূর্ব্বেই

বলা হইয়াছে, অন্তর ও বাহিরের প্রকৃতি মূলতঃ এক বা অভিন্ন; বাহ্য ও আন্তরপ্রকৃতি এক অখণ্ড। উপাধিযুক্ত আত্মার বাহ্য ও আন্তর প্রকৃতি উভয়ই দৃশ্য। বাহ্য ও আন্তর প্রকৃতির উপাদান মূলপ্রকৃতি অবিদ্যা বা মায়া। অতএব বাহ্য ও আন্তরপ্রকৃতি এক বা অভিন্ন। কিন্তু আন্তরপ্রকৃতির সহিত আত্মার অধ্যাস হওয়াতে বহির্জ্জগতের প্রকাশ বা উপলব্ধি মনই করিতেছে। প্রকৃত প্রস্তাবে আত্মাই আন্তর ও বাহ্যজগতের দ্রষ্টা। আন্তরপ্রকৃতির উন্মেষেই যদি সকল জ্ঞান হয়, তাহা হইলে বিশেষ ধর্ম্মমত (Positive Religion) বা সাধনাদির আবশ্যকতা কি? প্রাকৃতিক নিয়মেই (Natural Religion) সকল সম্পন্ন হইতে পারে; প্রাকৃতিক নিয়মেই সকল ক্রম-বিকাশ (Evolution) প্রাপ্ত হইবে—বাস্তবিক এ কথা বলিতে পারা যায় না। ধর্ম্ম বিশেষ প্রাকৃতিক উন্মেষের পথ প্রদর্শন করে। সাধক সাধন-রত থাকিয়া প্রকৃতির অনুকূল পন্থা খুঁজিয়া বাহির করেন। আন্তর প্রকৃতির বিকাশনের অনুকূল উপায়গুলি বাহির করাই বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মের কার্য্য, উহাতেই তাহার সার্থকতা। মানবের চিত্তের গঠন অনুসারে ধর্ম্মও বিভিন্ন হয়।

প্রকৃতপ্রস্তাবে ধর্ম্ম ও Religion একার্থবোধ নহে। ধর্ম্ম শব্দের অর্থ—যাহা ধারণ করিয়া রাখে বা 'Life-Principle.' Religion শব্দের অর্থ—পুনর্যোগ; Re অর্থ again এবং Legia to join. পাশ্চাত্য দর্শনের Positive Religion বা 'বিশেষ মতবাদ' আমাদের দেশের ধর্ম শব্দের একার্থবোধক হইতে পারে না। সেইজন্যই অনেকস্থলে আমরা উভয় দর্শনের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারি না। আমাদের 'ধর্ম্ম' শব্দটী আন্তর প্রকৃতির অনুকূল সাধনার দ্যোতক, যাহাতে ধারণ করিয়া রাখে তাহাই ধর্ম্ম। এই জন্যই আমাদের দেশে অধিকারী ভেদে ধর্ম্মেরও ভেদ। এবং উপাসকের চিত্তের বিভিন্নতার জন্য উপাস্যেরও বিভিন্নতা হইয়াছে। একই বস্তু চিত্তের বিভিন্নতা অনুসারে বিভিন্নরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। যে চিত্ত বীর্য্যপূর্ণ, সে বীর্য্যের মূর্ত্তিরই উপাসনা করিবে। যাহার হৃদয় কোমল, করুণায় পরিপূরিত, সে করুণার মূর্ত্তির উপাসনা করিবে। যে ভীষণতা ভালবাসে, তাহার পক্ষে ভীষণ মূর্ত্তিই লোভনীয়; এক্ষেত্রে অন্যের নিকট ভীষণ হইলেও তাহার নিকট ইহা নয়নাভিরাম। খৃষ্টান ধর্ম্ম অধিকারী-ভেদ স্বীকার করে না বলিয়াই বোধ হয় পাশ্চাত্য

দর্শনের Positive ও Natural Religion এর এই বিরোধ। উপাসনার ধারার বিভিন্নতা না থাকায় এত বিরোধের সূত্রপাত হইয়াছে। প্রকৃতির অনুকূল সাধনা বাহির হইতে নির্দ্দেশ করা যায় না। আন্তর প্রকৃতিতে ডুবিলে, সকল চিত্তের মূলে এক অখণ্ড বস্তুতে মনোনিবেশ করিলে, সেই অনুকূল সাধনার তত্ত্ব প্রকাশিত হয়। বাহিরের বিভিন্নতায় (Plurality) প্রকৃতির অনুকূলতা পাওয়া যায় না, বিচিত্রতাই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সেই বিভিন্নতার মূলে যে একত্ব (Unity) তাহা অন্তর্নিবিষ্ট হইলেই প্রকাশিত হয়। বাহিরের প্রকৃতির নিয়ম নির্দ্দেশ করা যায়, সেই নিয়মসমূহের হেতু বা কারণ নির্দ্দেশ অসম্ভব।

ধর্ম্মের সার্থকতা আন্তর প্রকৃতির বিকাশে। অন্তর্নিহিত শক্তির উদ্বোধনের সহায়ক ধর্ম্ম। ধর্ম্ম কেবল লক্ষ্য বস্তু প্রাপ্তির পথ-প্রদর্শক। ধর্ম্ম বস্তুকে প্রকাশ করিতে পারে না, বস্তু নিজেই প্রকাশিত। ধর্ম্ম কেবল ধারণ করে, অর্থাৎ সেই প্রকাশের আবরণ বিদূরিত করিয়া স্বচ্ছ সরল স্বাভাবিক ভাবে অবস্থানের পন্থা নির্দ্দেশ করে। তাই ধর্ম্ম বলিতে Natural Religion অনেকাংশে বলা

চলে। অতএব ধর্ম্মের সার্থকতা নাই ইহা বলা চলে না ; পরন্তু ধর্ম্মই আন্তর প্রকৃতির প্রকাশের গৌণ সহায়। এখন আর একটী প্রশ্ন উপস্থিত হইতে পারে, গুরুর আবশ্যকতা কি? প্রাকৃতিক নিয়মেই ত অন্তঃকরণের বিকাশ হইবে? না এ কথা বলিতে পারা যায় না,—কারণ গুরু অন্তরে ডুবিয়া আছেন। তিনি অন্তরের মূল-তত্ত্বে তন্ময়ত্ব লাভ করিয়া বাহিরের প্রকৃতির বিশ্লেষণ (analysis) করিতে সম্পূর্ণ পারগ। চিত্তের চাঞ্চ-ল্যের জন্য আমি আমার অনুকূল বস্তুটী গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। নিজের বৃত্তিগুলি আমাকে সংশয়ে নিমজ্জিত করিতেছে। আবার অন্যদিকে বাহিরের নানা প্রকার ভাবরাশি প্রত্যহই আমার মনকে বিচলিত করিতেছে, মনের চাঞ্চল্য বৃদ্ধি পাওয়াতে আমি কোন কিছুই স্থির করিতে পারি না ; কিন্তু গুরু অন্তর্নিবিষ্ট, তিনি সংযত। তিনি তাঁহার সংযত চিত্তে সংযম (ধারণা, ধ্যান, সমাধি) পূর্ব্বক আমার আবশ্যকতা, আমার Element বা স্বরূপ বুঝিতে পারেন ; এবং কি প্রকার সাধন আমার চিত্তের অনুকূল তাহা ধরিয়া দিতে পারেন। এস্থলেও প্রশ্ন হইতে পারে, আমার অবস্থা আমি যতটা বুঝিব, অন্যে ততটা কি প্রকারে বুঝিবে?

এ কথার অনেকটা সার্থকতা থাকিলেও সকল বিষয় আমার নিকট প্রতিভাত হয় না। চিত্ত চঞ্চল থাকিলে আমার কি কি অভাব অভিযোগ, তাহা আমি বুঝিতে পারি না। বরং অন্য কেহ পর্য্যবেক্ষণ পূর্ব্বক তাহা বেশ বলিয়া দিতে পারেন। কারণ তাঁহার চিত্ত-দর্পণে আমার চিত্তের ছায়া পড়িয়াছে; কিন্তু আমার চিত্ত মলিন বলিয়া তাহা আমার নিকট প্রকট নহে। নির্ম্মল দর্পণে মলিন দর্পণের প্রতিবিম্ব পড়ে; অতএব গুরুর আবশ্যকতা স্বীকার্য্য। এ সম্বন্ধে অন্যান্য কারণও আছে, কিন্তু তাহা অপ্রাসঙ্গিক। অতঃপর প্রশ্ন হইতে পারে, শাস্ত্রের আবশ্যকতা কি? শাস্ত্র অজ্ঞাতজ্ঞাপক (অজ্ঞাতজ্ঞাপকং শাস্ত্রং)। যাহা সকলে জানে, তাহা জানাইবার কোনও আবশ্যকতা নাই; যাহা অজ্ঞাত কিন্তু যাহার উপরে সকল প্রতিষ্ঠিত, সে বস্তুটী দেখান একান্ত আবশ্যক। শাস্ত্র সেই অতীন্দ্রিয় বস্তুটী দেখাইবার চেষ্টা করে। ধর্ম্ম, গুরু, শাস্ত্র প্রভৃতি বাহ্যপ্রকৃতি। প্রকৃত প্রস্তাবে উহারা আন্তরপ্রকৃতির উন্মেষের সাহায্যকারী। অতএব শাস্ত্রের আবশ্যকতা অবশ্যই স্বীকার্য্য। শাস্ত্র ঋষি-গণের সাধনার ফল। তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ প্রকৃতির

মূলতত্ত্ব জানিয়াছেন, প্রকৃতির অনুকূল বস্তু সকলও বুঝিয়াছেন। মানব-প্রকৃতির উন্মেষের সহায়ক অনুষ্ঠানের পন্থা দেখিয়াছেন। ইহাই শাস্ত্রে নিবদ্ধ। চিত্তের বিভিন্নতা সত্ত্বেও যে একত্ব আছে, তাহাতে অভিনিবিষ্ট হইয়া সাধনার ক্রম শাস্ত্রে বিধিবদ্ধ হইয়াছে; অতএব শাস্ত্রের আবশ্যকতা আছে। উহা আন্তর প্রকৃতির উন্মেষের সহায়ক।

Education শব্দটীর প্রকৃতি প্রত্যয় [root] খুঁজিলে দেখিতে পাই (L. *educare,-atum—edu-cere—e, out, ducere, to lead.*) অন্তর্নিহিত শক্তি-কেই বাহিরে বিকশিত করা। Culture শব্দটীও L. *cultura colere* ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। L. *Colere* ধাতুর অর্থ *to till, to worship,* ভূমি খনন করা এবং উপাসনা করা। কৃষি করার অর্থও বীজের অন্তর্নিহিত শক্তিকে বিকশিত করা বা উদ্বুদ্ধ করা; উপাসনার অর্থও আভ্যন্তরীণ শক্তির বিকাশ। উপ+আস্ ধাতু হইতে উপাসনা শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। নিকটে বসিয়া ভাবে ভাবিত হওয়াই উপাসনা। অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশেই উপাসনার তাৎপর্য্য। আন্তর প্রকৃতির বিকাশের অনুকূলতা একান্ত আবশ্যক। ফুল ফুটিবার

সময় এক বিন্দু শিশিরেই ফুলটি ফুটে। কিন্তু অধিক পরিমাণে বৃষ্টি হইলে ফুলটি ভাল বিকশিত হইতে পারে না। ধান্যের যখন শীষ বাহির হয়, তখন অধিক পরিমাণে বৃষ্টি হইলে ধান্য নষ্ট হইয়া যায়। বাহ্য প্রকৃতির সহায়তা আন্তর প্রকৃতির অনুকূলেই হওয়া আবশ্যক, প্রতিকূলে হইলে কখনই বিকশিত হইতে পারে না। দুগ্ধের অন্তর্নিহিত শক্তিতেই দুগ্ধ দধিরূপে পরিণত হয়। তিলের শক্তি হইতেই তৈল হয়। কিন্তু বালুকা হইতে বাহ্যপ্রকৃতির শত চেষ্টায়ও দধি বা তৈল প্রস্তুত হইতে পারে না। বাহ্যপ্রকৃতি হইতে যদি সকল উৎপন্ন হইত, তাহা হইলে সকল বস্তু হইতেই সকল বস্তু উৎপন্ন হইতে পারিত। কিন্তু তাহা কখনই হয় না। গরুর মল হইতে বৃশ্চিকের উৎপত্তি। পুরুষ হইতে কেশ, লোম, নখ প্রভৃতির উৎপত্তি। স্বেদ হইতে প্রাণীসমূহের উৎপত্তি। সর্ব্বত্রই স্বাভাবিক ক্রম, আন্তর প্রকৃতির বিকাশ। যদি অভিজ্ঞতার ফলে জ্ঞান হইত, তাহা হইলে শিক্ষার বলে পশুকেও মানুষ করা যাইত। তাহা কখনই সম্ভব নহে। পশুর পশুত্ব থাকিবে, তাহা না হইলে সৃষ্টিতে চিত্তের বৈষম্য থাকিত না, মানসিক শক্তির তারতম্য থাকিত না, বিশেষতঃ প্রতিভা

ন্যমক জিনিষের কোনও প্রকাশ দেখা যাইত না। কর্ম্মবীর Napoleon, Peter the Great, Frederick the Great, Bismark, বাজীরাও প্রভৃতির ; দার্শনিক আচার্য্য শঙ্কর, Kant, Spinoza, Descartes, Leibnitz, Hegel প্রভৃতির ; কবি কালিদাস, Shakespeare প্রভৃতির কোনও বিশেষত্ব থাকিত না। অতএব সিদ্ধান্ত করিতে পারা যায় যে, সবলতা বা দুর্ব্বলতা প্রকৃতিগত, উহা পারিপার্শ্বিক অবস্থার ভিতর দিয়া বিকাশ প্রাপ্ত হয়। প্রকৃতির অনুকূল বস্তু গ্রহণ করিয়া স্থূল রূপে পরিপুষ্ট হইয়া প্রকাশ পায়। অন্তরে সবলতার বীজ নিহিত আছে, কেবল তাহার উদ্বোধন, আমন্ত্রণ, অধিবাস করিলেই জাগ্রত হয়। চণ্ডীর "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু" ইত্যাদি সর্ব্বত্রই অন্তর্নিহিত শক্তির আহ্বান। সবলতাব উন্মেষের জন্য অনুকূল ভাব গ্রহণ করা আবশ্যক, প্রতিকূল ভাবে উহা বৃদ্ধি পাইতে পারে না. ইহা আমরা পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন করিয়াছি। তবে সবলতা লাভের পন্থা কি ? উত্তরে এই বক্তব্য—"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্যবরান্নিবোধত।" (কঠ, ১।৩।১৪) সুপ্ত জীব প্রবুদ্ধ হও, আত্মজ্ঞানাভিমুখীন হও, তোমার সকল অনর্থের বীজভূতা ঘোররূপা অজ্ঞান-নিদ্রা পরিহার

কর। কি উপায়ে? প্রকৃষ্ট গুরু-আচার্য্যের নিকট বিনয় পুরঃসর উপনীত হও, এবং তাঁহার উপদেশ অনুসারে সর্ব্বান্তর আত্মাকে "সোঽহং" রূপে উপলব্ধি কর। ইহাই সবলতার সাধন।

চতুর্থ অধ্যায়।

সাধনের রূপ।

সাধকগণের মধ্যে সচরাচর দুই প্রকারের সাধক দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম সবল সাধক বা বীর সাধক, দ্বিতীয় দুর্ব্বল সাধক। দুর্ব্বল সাধক নিজের শক্তিতে বিশ্বাসহীন। সে ভগবৎ শক্তির অফুরন্ত ভাবও উপলব্ধি করিতে পারে নাই,---ভগবানে নির্ভর করিতে না পারিয়া কেবল কাতরে ক্রন্দন করিতে থাকে। নির্ভর করিতে হইলে শক্তির আবশ্যকতা; বিশ্বাসের দৃঢ়তা বা সবলতা না থাকিলে নির্ভর হইতে পারে না। দুর্ব্বলের সংশয় অত্যন্ত বেশী। সে ভগবানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারে না। সে সর্ব্বদা সঙ্কুচিত, সশঙ্কিত, প্রতি পদক্ষেপে পাপের ভয়ে চকিত, ত্রস্ত।

কেবল বলিতেছে—"কাতরে করুণা কর দীন দয়াময়ী।" ইহার অধিক কিছু করিবার শক্তি বা সামর্থ্য তাহার নাই। শক্তিমান্‌ই শক্তিমানকে বিশ্বাস করিতে পারে। অশক্ত সর্ব্বদাই ভয়ে ভীত, তাহার পক্ষে পরের বীর্য্যেও বিশ্বাস থাকে না। তাই দুর্ব্বল সাধক কেবল কাতর প্রার্থনা করিয়া জীবন যাপন করে।

সবল সাধকের গতি ও পন্থা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তাঁহার বিশ্বাসের দৃঢ়তা আছে। সে সরলভাবে ভগবানে নির্ভর করিতে পারে; ভগবানে তাহার বিশ্বাস অটল অচল; সে জোরের সহিত বলিয়া উঠে "আমি ভক্তির জোরে কেড়ে নেব ব্রহ্মময়ীর জমিদারী"। বীর সাধক কখনও ভাবে, 'তোমার আমি' [তবৈবাহম্], আবার কখনও উদাত্ত কণ্ঠে বিঘোষিত করে 'আমারই তুমি' [মমৈবত্বম্], আবার আনন্দে মগ্ন হইয়া আপনার পূর্ণতায় 'তুমি আর আমি এক' [সোঽহম্] অনুভব করে। সবল সাধকের ভাষায় জোর, ভাবে জোর, সাধনায় জোর। সে যেন সবলতার প্রতিমূর্ত্তি। তাঁহার মৃত্যুর ভয় নাই, কারণ ভগবানে তাহার দৃঢ় বিশ্বাস। পাপ তাঁহার নিকট হইতে দূরে পলায়ন করে, পুণ্য তাঁহার সঙ্গী। সাধক বীরহৃদয়ে গাহিয়া উঠে—"আমি

আর ডরি কারে, রাজা যার মা মহেশ্বরী, আমি আনন্দে আনন্দময়ীর খাস তালুকে বসত করি।"

তাঁহার প্রার্থনা সবল। বীর্য্য চাই, বল চাই, তেজ চাই, তোমার শক্তিতে শক্তিমান্ হইতে চাই, তোমাকে পাইতে চাই, তুমি আমি এক হইয়া যাইতে চাই। কবির ভাষায় বলে—

"পূজা দিয়া পদে করি না ভিক্ষা,
বসিয়া করি না তব প্রতীক্ষা।
কে কারে জিনিবে হবে পরীক্ষা,
তোমারে আনিব বাঁধিয়া।"

সাধকের ভাষায় গর্জ্জিয়া উঠে—

"চল দেখি মন সাধন সমরে
দেখি মা হারে কি পুত্র হারে।"

সবল সাধক "হারাই হারাই সদা মনে হয়, হারাইয়া ফেলি চকিতে" ইহা বলিতে স্বীকৃত নয়। সে জানে ভগবান্ তাহার আপনার জিনিষ, তাহাতে ও ভগবানে কোন ব্যবধান নাই। তাঁহার বলই আমার বল, তাঁহার সত্তাই আমার সত্তা, তাঁহার প্রভাবই আমার প্রভাব। তাই ভয়, সঙ্কোচ, সন্দেহ, সংশয় তাহার আদপেই

থাকে না। সাধক মায়ের কোলে বসিয়া মায়ের নিকট আব্দার করে। মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া মায়ের বক্ষে মুখখানি রাখিয়া মাকে আপনার করিয়া লয়, তখন সকল জগৎকে বলে "এখন ? কে কি কর্‌বে, এস !"

তন্ত্রের সাধনার মূলে সর্ব্বত্রই বীর ভাবের সাধনা। শ্মশানে শব-সাধন, গভীর রাত্রির শ্মশান-সাধন, সর্ব্বত্রই বীরের ন্যায় বীর্য্যকে বরণ করিবার প্রচেষ্টা দেখিতে পাই। বৈদিক সাধনায় সর্ব্বত্রই তেজ, দীপ্তি, মহানের সাধনা। সর্ব্বত্রই সমষ্টির সাধনা। গায়ত্রী, শাণ্ডিল্য-বিদ্যা, দহর-বিদ্যা, বৈশ্বানর-বিদ্যা, মধু-বিদ্যা সর্ব্বত্রই ব্যাপক ভাবের উপাসনা—কোথাও খণ্ড ছিন্নভাবের উপাসনা দেখিতে পাওয়া যায় না। তান্ত্রিক আচমনে "আত্মতত্ত্বায় স্বাহা, বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা, শিবতত্ত্বায় স্বাহা"—ইহাই শিখায়। শিবতত্ত্বই তাহার লক্ষ্য। তাই সে নির্ভীক। বৈদিক সাধক আনন্দ-সাগরের আনন্দ-লহর (শক্তি) লইয়া খেলা করিবে—আনন্দনির্ঝরের মূলতত্ত্ব (স্বভাবতত্ত্ব) অন্বেষণ করিবে। আনন্দ-প্রদীপ জ্বালাইয়া সে আপনার আনন্দে চলিয়াছে। আনন্দ-কাননে বিচরণ করিতে করিতে সে আনন্দ-বিজ্ঞান লাভ করিবে। তাহার ভয় কোথায় ? ভগবানও গীতায়

বলিয়াছেন, "তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তি বিশিষ্যতে," (৭।১৭) "তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে প্রণশ্যতি।" (৬।৩০)

শ্রুতিও বলিয়াছেন, "তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ"। (ঈশ, ৭)। একত্বদর্শী জ্ঞানীর মোহই বা কি, আর শোকই বা কি? "জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য, চিত্ত ভাবানাহীন" এই ভাব না হইলে সাধনা হয় না। সাধক দেখিতে পায়, শক্তির উৎস তাহার ভিতরে—যে আনন্দ-হ্রদের অনুসন্ধানে সে বিশ্ব ঘুরিয়াছে, সে আনন্দ-হ্রদ তাঁহার অন্তরেই। তখন সে আনন্দে গাহিয়া উঠে—

বেদাহমেতৎ পুরুষং মহান্তং
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ। (শ্বেত, ৩।৮)

আমি পরমপুরুষ পূর্ণব্রহ্মকে জানিয়াছি। তিনি সর্ব্বপ্রাণিগত, সর্ব্বসাক্ষীস্বরূপ, স্বয়ম্প্রকাশ। তাঁহাকে জানিতে পারিলেই অজ্ঞান বিনষ্ট হয়।

সাধক প্রার্থনা করে, "আপ্যায়ন্তু মমাঙ্গানি বাক্-প্রাণশ্চক্ষুঃশ্রোত্রমথ বলমিন্দ্রিয়ানি চ," (সামবেদীয় শান্তি-মন্ত্র) বাক্, প্রাণ, চক্ষু, কর্ণ, বল, ইন্দ্রিয় সকল আপ্যায়িত হউক। সকল সবল হউক। দুর্ব্বলতা পরিহার করিয়া

হৃদয় সবল হউক, ইহাই তাহার প্রার্থনা। সাধক বল চায়, তেজ চায়। সে কাতর নহে, সে দুর্ব্বল নহে, সে ভীরু নহে। সে ব্রহ্মবীর্য্য চায়, সে আত্মাগ্নিতে পাপ আহুতি দিয়াছে। "যৎকিঞ্চিৎ দুরিতং ময়ি তৎ সর্ব্বং সূর্য্যে জ্যোতিষি পরমাত্মনি জুহোমি স্বাহা।" সে সূর্য্যস্বরূপ পরমজ্যোতির্ম্ময় পরমাত্মায় সকল পাপ আহুতি দিয়াছে—পাপসমূহ ভস্মীভূত হইয়াছে। সে নিষ্পাপ, নির্ভয়। গুরুতে ভগবানে অটল অচল বিশ্বাসী। তাহার হৃদয় সংশয়ে আন্দোলিত হয় না, দুঃখে বিচলিত হয় না, হর্ষে অকারণ উৎফুল্ল হয় না। তাহার হৃদয় নির্ব্বাত-নিষ্কম্প-প্রদীপ-শিখার ন্যায় উজ্জ্বল। তাহাতে কালিমা নাই। সে বীর সাধক—সে যোগী। তাই সে মহাদেবের ন্যায় মদন ভস্ম করিয়াছে, বুদ্ধদেবের ন্যায় মারকে পরাজিত করিয়াছে, তপস্যায় একাগ্র হইয়াছে, সাধনায় অটল, অচল। সে বুদ্ধদেবের ন্যায় বলে,—

"ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং
ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চযাতু
অপ্রাপ্য বোধিং বহু-কল্প-দুর্ল্লভাং
নৈবাসনাৎ কায়ঃ সমুচ্চলিষ্যতে"।

সে ভীষণ প্রতিজ্ঞায় সাধনসমুদ্রের অতল-তলে ডুবিয়াছে। সে নিজস্ব শক্তির বলেই নির্ভয়ে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। সে জানে, "যত্রৈব যত্রৈব মনোমদীয়ং, তত্রৈব তত্রৈব তব স্বরূপম্"। লোভ তাহার নাই। থাকিবেই বা কেন? অগাধ সমুদ্রে যে ডুবিয়াছে—অনন্তরত্ন যাহার করতলগত, সে কেন সামান্য জলবিন্দুর জন্য পাগল হইবে? যে সর্ব্বকাম, সর্ব্বরস, সর্ব্বগন্ধকে পাইয়াছে—তাহার আবার কোন্ বস্তুতে লোভ হইবে? সে বলিয়া উঠে—

"ত্রৈলোক্যরাজ্যমপি দেব তৃণায় মন্যে"।

প্রথম অধ্যায়।

নৈতিক সমস্যা।

নৈতিক দুর্ব্বলতা বা নৈতিক দাসত্বে মনুষ্যত্বের বিকাশ হইতে পারে না। নৈতিক জীবনের মূল্য আছে, কিন্তু নৈতিক দাসত্ব কখনই বাঞ্ছনীয় নহে। নৈতিক দাসত্বই দুর্ব্বলতা।

লোক যেমন কুসংস্কারের দাস হইয়া পড়ে, সেরূপ অনেক সময় নৈতিক দাসত্বও প্রাপ্ত হয়। এই নৈতিক দাসত্বে (moral slavary) মানুষ কর্ম্মবিমুখ হইয়া পড়ে। কর্ম্মবিমুখ হইয়া পড়িলে চিত্ত পাপ-পথে প্রধাবিত হওয়াই স্বাভাবিক; যে পাপ দূর করিবার জন্য নীতির দাসত্ব স্বীকার করিল, সেই পাপই তাহার সাথের সাথী হইয়া পড়িল। বৌদ্ধধর্ম্মের নৈতিক দাসত্বের ফলে ধর্ম্মের গ্লানি অবশ্যম্ভাবী হইয়া দাঁড়াইল। বৈদিক কর্ম্মবাদ প্রত্যাখান করিয়া অহিংসার দোহাই দিয়া যজ্ঞাদি ক্রিয়া বন্ধ করিয়া, কেবল মাত্র নৈতিক জীবনের উপর দাঁড় করাইতে গিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের ভিতরে নানারূপ অভিচার ক্রিয়ার ও পূজা-পদ্ধতির সৃষ্টি করা আবশ্যক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহা ঐতিহাসিক সত্য। বর্ত্তমান খৃষ্টান সমাজও খৃষ্টান ধর্ম্মের সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া কেবল নীতির দাসত্বের ফলে এক নূতন আকার ধারণ করিয়াছে। শুধু নৈতিক মতে মানুষ গঠিত হইতে পারে না। আমাদের দেশেও কর্ম্মবিহীন নৈতিক দাসত্বপূর্ণ বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্লানির আধার হইয়া লোকসমাজকে আকৃষ্ট করিতে পারিতেছে না। বঙ্গদেশের ব্রাহ্মসমাজের অবস্থাও

অনেকটা তদ্রূপ। কেবল নৈতিক দাসত্বে ব্রাহ্মসমাজ কর্ম্মবিহীন হইয়া পড়িয়াছে। আজকাল সেই জন্যই সাধারণ হিতকর কার্য্যে কেহ কেহ আত্মনিয়োগ করিতেছেন দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা হয়ত বুঝিয়াছেন —ঐরূপ নৈতিক জীবন দাঁড় করান যাইতে পারে না। বোধহয় এ রকম অবস্থা স্মরণ করিয়াই জর্ম্মণ দার্শনিক Nietzsche ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন, এবং একদল আভিজাত্যের সৃষ্টি করিতে উপদেশ দিয়াছেন।*

---

* "Aristocracy must show the value of life by the mere fact of their existence * * * * * * * The true estimate of life, as the sense of energy and might (*Nietzsche later calls it Der Wille Zur Macht*) has frequently been over-thrown by the uprising of the moral slaves in *Buddhism*, in *Socrates*, in *Christianity*, in modern *humanism* * * *

Nietzsche frequently expresses himself as if he would abolish all morality. But he really demands nothing more than an inversion which has been necessitated by the domination of the morality of slavery.

(*Hoffding's History of Philosophy.* Edited by C. F. Sanders. Ed. 1915 P. 308—9,)

, কর্ম্ম মাত্রেরই একটু দোষ থাকিবে, নির্দ্দোষ কর্ম্ম অসম্ভব। ভগবান্ গীতায় ইহা স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন—"সর্ব্বারম্ভাঃ হি দোষেন ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ," কিন্তু "সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।" যাহা স্বাভাবিক কর্ম্ম, তাহা দোষযুক্ত হইলেও ত্যাগ করিতে নাই। হিংসা, নৈতিক মাপকাঠিতে অবশ্যই অন্যায়, কিন্তু যুদ্ধে হিংসা বৈধ, বিধিসঙ্গত ও ন্যায়ানুমোদিত। লোকহত্যা করা অন্যায়, কিন্তু আত্মরক্ষার্থে নরহত্যা বিহিত। কোনও স্ত্রীলোকের উপরে কেহ বল প্রকাশ করিতেছে, এমতাবস্থায় তাহাকে হত্যা করিলে অন্যায় হয় না, বরং সে ক্ষেত্রে না করাই অন্যায়। নৈতিক জীবনে সত্য বলা অবশ্যকর্ত্তব্য, কিন্তু কোন কোনও স্থলে তাহা আবার অন্যায়ও। যেমন, কোনও লোক দস্যুগণ কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া আমার নিকট আশ্রয় ভিক্ষা করিল; আমিও তাহাকে আশ্রয় দিলাম, কেননা—দস্যুরা পাইলেই তাহাকে মারিবে। দস্যুরা আসিয়া আমাকে আশ্রিত ব্যক্তির সন্ধান জিজ্ঞাসা করিলে, আমি সত্য না মিথ্যা বলিব? এ স্থলে কোন্‌টী কর্ত্তব্য? কোনও শত্রুকে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে আমি গুলি করিলাম, কিন্তু তখনই আমার শত্রুকে খাইবার জন্য ব্যাঘ্র উদ্যত হইল,

শত্রুর শরীরে গুলি না লাগিয়া ব্যাঘ্রের শরীরে লাগিল;, ব্যাঘ্র মারা গেল, লোকটীর প্রাণ রক্ষা হইল। এখানে প্রাণ-রক্ষাজনিত পুণ্য হইবে কি? দান করা পুণ্য কার্য্য ও কর্ত্তব্য; কিন্তু অহঙ্কারের সহিত লোককে তিরস্কার করিয়া দান করিলে কি তাহাতে দানের ফল হইবে? রেলগাড়ীতে চলিয়াছি, আমার নিকট এমন কোনও কাগজ আছে, যাহা ধরা পড়িলে দশজন লোকের প্রাণ দণ্ড হইবে; গাড়ীর ভিতরে আমার মা ও ভগ্নী চলিয়াছেন; কোনও দুষ্টলোক তাঁহাদের প্রতি দুর্ব্যবহার করিতে উদ্যত। আমি তাহাকে শাসন করিতে গেলেই কাগজ সহিত ধরা পড়িতে পারি, এমতাবস্থায় কি কর্ত্তব্য? পিতার আদেশ প্রতিপালন করা উচিত, কিন্তু পিতার আজ্ঞায় মাতাকে হত্যা করা কর্ত্তব্য কি না? প্রজার প্রতি রাজার কর্ত্তব্য আছে, এবং ধর্ম্মে স্ত্রী প্রভৃতির উপরেও কর্ত্তব্য আছে, এখন প্রজার সন্তোষের জন্য স্ত্রী ত্যাগ উচিত কি না? বিশ্বাসঘাতকতা অতি নিকৃষ্ট; শাস্ত্রে বলে,

"ন ভারাঃ পর্ব্বতাঃ ভারাঃ ন ভারাঃ সপ্ত সাগরাঃ।
নিন্দুকস্থ মহাভারাঃ ভারাঃ বিশ্বাসঘাতকাঃ।"

কিন্তু যুদ্ধের সময় ভেদনীতি দ্বারা কোনও লোককে বিশ্বাসঘাতকরূপে পরপক্ষের নির্য্যাতনের জন্য গ্রহণ করা ধর্ম্ম কি না? রাজা প্রজাকে দণ্ড দেন, শাসন করেন, ফাঁসী দেন, তাহা উচিত কি না? পিতা পুত্রকে, মাতা সন্তানকে শাসন করেন, তাহা সমীচীন কি না? শিক্ষক ছাত্রকে শাসন করেন, তাহা উচিত কি না? ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর হত্যাও নৈতিক ন্যায়ে অবশ্যই বিগর্হিত, কিন্তু তাহাদিগকে মারা উচিত কি না? দেশ বা ধর্ম্মরক্ষার জন্য লোকহত্যা, কি মিথ্যা প্রবঞ্চনা করা উচিত কি না? রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ছল চাতুরী দরকার হয়, তাহা অধর্ম্ম কি না? যে ক্ষেত্রে দশের ক্ষতি হইতে পারে, সে ক্ষেত্রে সরলতা অবলম্বন করা যুক্তিযুক্ত কি না? শরীর ধারণের জন্য আহার্য্য গ্রহণ করিতে হয়, তাহাতেও জীবহত্যা অবশ্যম্ভাবী; এমতাবস্থায় আহার গ্রহণ উচিত কি না? দেশদ্রোহী, সমাজদ্রোহী ব্যক্তির শাসন উচিত কি না? না, তাহার প্রতি দয়া প্রকাশ করিব? কারণ দয়াই ধর্ম্ম। অত্যাচারীকে ক্ষমা করিব কি না? আমার স্বাধীন হইবার চেষ্টায় অন্যের ক্ষতি হয়, তাহার চেষ্টা করিব কি না? দশের উপকারের জন্য এক জনকে বিনাশ করা যাইতে

পারে—ইহাই utilitarian দের মত। কিন্তু যে ক্ষেত্রে ১০০ লোকের রক্ষার জন্য ৯৯ জনকে বা ৯৮ জনকে মারিতে হয়, সে ক্ষেত্রে utilitarian কি বলিবেন? যুদ্ধ আরম্ভ হইল; আমার জাতীয় জীবন রক্ষা করিতে হইবে, অন্য জাতিরও জাতীয় জীবন অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে, উভয় পক্ষের জনসংখ্যা সমান, উভয় পক্ষের ন্যায্য অধিকারও সমান; এক পক্ষ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে অন্য পক্ষের জাতীয় জীবন সঙ্কটাপন্ন হয়, এমতাবস্থায় যুদ্ধ করিলে উভয় পক্ষের লোকক্ষয় অনিবার্য্য। এক্ষেত্রে utilitarianএর মত খাটিল না। "Highest good to the greatest number" এ কথার মূল্য এক্ষেত্রে কোথায়? কারণ উভয় পক্ষেই 'Highest good' উভয়ই সর্ব্বোচ্চ ভাবে অনুপ্রাণিত, number বা সংখ্যাও সমান। এক্ষেত্রে utility খাটিল কোথায়? যদি বলি 'End justifies the means', লক্ষ্য মহান্ হইলে উপায়ের ভাল মন্দে কিছুই আসে যায় না, একথা বলিলেও উভয় পক্ষের End বা লক্ষ্য সমান। কারণ উভয়ই জাতীয় জীবন রক্ষার জন্য সচেষ্ট। বিচারের মাপকাঠি তাহা হইলে কোথায় রহিল? স্ত্রীর ধর্ম্ম স্বামীর অনুগমন করা, স্বামী ধর্ম্মত্যাগ করিলে স্ত্রীর পক্ষে

স্বামীর অনুগমন ছাড়াও ব্যক্তিগত ভাবে ধর্ম্ম আছে, সে অবস্থায় স্ত্রী কি করিবে? মাতৃস্নেহ মাতার ধর্ম্ম। মাতা যে ধর্ম্মের অনুশাসন মানেন, পুত্র তাহা ত্যাগ করিল; মাতা এ অবস্থায় কি করিবে? যদি বল মাতা সন্তানকে তাহার ধর্ম্মপথে চলিতে দিবে, এ বিষয়েও একটী প্রশ্ন আছে। পুত্র যুদ্ধে গেল, কাপুরুষের মত ভয়ে প্রাণ রক্ষার জন্য পলাইয়া আসিল, এক্ষেত্রে পুত্র প্রাণ রক্ষাই ধর্ম্ম মনে করিয়াছে। মাতা যদি সন্তানকে পুনরায় যুদ্ধে পাঠায়, তাহা অন্যায় হইবে কি না? অনেক লোকেই ট্যাক্স দিতে নারাজ, বোধহয় এমন লোক খুব কম আছে যে ট্যাক্স দিতে বেশী ইচ্ছুক। রাজকীয় কার্য্যের জন্য বেশী ট্যাক্সের দরকার। স্থলবিশেষ রাজার কার্য্যের গুরুত্ব প্রজাসাধারণ ধারণা করিতে পারে না। কিন্তু জনমত ট্যাক্স দিবার বিপক্ষে। এক্ষেত্রে কি রাজা ট্যাক্স আদায় করিবেন না? দেশের লোক conscription বা বাধ্যতামূলক সৈন্যশ্রেণী ভুক্ত হওয়া পছন্দ করে না, তখন রাজা কি বলপূর্ব্বক তাহাদিগকে যুদ্ধে বাধ্য করিবেন না? অতএব সাধারণের ইচ্ছা ভগবানেরই ইচ্ছা "Vox Populi vox dei" (The voice of the people is the voice of God.), ইহার

ব্যতিক্রম হইতে চলিল। রাজা শত শত হৃদয়ের দুঃখোৎপাদন করিলেন, ইহা অন্যায় হইল কি না? এই সকল প্রশ্নের উত্তর কি? কর্ত্তব্যের মানদণ্ড কোথায়? নীতিজ্ঞ কর্ত্তব্যের দোহাই দিতেছে। কর্ত্তব্যের মাপ-কাঠি দেখাইয়া দেওয়া নীতিজ্ঞের পক্ষে অসম্ভব। কারণ রাত্রিতে আলো জ্বালিলে পোকা মরে, কিন্তু অন্ধকারে থাকিলেও পায়ের নীচে পড়িয়া পোকা মরিতে পারে, তাহাতেই বরং পোকা মরার সম্ভাবনা বেশী, নীতিজ্ঞের উভয় সঙ্কট।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

বিচারের মানদণ্ড।

পাপ পুণ্যের বিচারের মানদণ্ড বাহিরে নাই। কর্ত্তব্য ব্যক্তিগত, "Duty has subjective reality but no objective reality." বাহিরের মাপ-কাঠি দিয়া কর্ত্তব্যের বা পাপ পুণ্যের বিচার করা চলে না। কর্ত্তব্যের ব্যক্তিগত বাস্তবত্ব আছে। নৈতিক কর্ত্তব্যের মাপ-কাঠি ভিতরে বলিয়া, উহা ব্যক্তিগত বলিয়া,

সবলতাই নীতি-শাস্ত্রের মূল। সবলতার উপরেই নীতির সৌধ দাঁড়াইয়া আছে। রাজার পররাজ্য আক্রমণ ধর্ম্মানুমোদিত, কিন্তু দস্যুর বা তস্করের পরদ্রব্য গ্রহণ অধর্ম্ম ও অন্যায়। কেন? রাজা সবল, দস্যু-তস্কর দুর্ব্বল। নরহত্যা অতীব বিগর্হিত, কিন্তু যুদ্ধে বিহিত; কারণ যুদ্ধ সবলতার নিদর্শন। হিংসা অবিহিত, কিন্তু যজ্ঞার্থে হিংসা বিহিত। রাজার পররাজ্য-জয় ও দস্যুবৃত্তির মধ্যে আর কোনও ভেদ নাই। ভেদ কেবল সবলতায়। দস্যুও বলপূর্ব্বক অপহরণ করিয়া দশ-জনকে বিতরণ করিতেছে, আর রাজাও তাহাই করিতেছেন; পার্থক্য কেবল সবলতায়। শত্রুকে পরাজিত করিবার জন্য রাজা ছল-চাতুরী অবলম্বন করিতেছেন, কিন্তু কোনও ব্যক্তি ছল-চাতুরী করিলে তাহাকে শাসন করা হইতেছে। ইহার সামঞ্জস্য কোথায়? সামঞ্জস্য সবলতায়। "তেজীয়সাং ন দোষায়" —ইহাই মানবের নৈতিক মানদণ্ড। পিতা পুত্রকে শাসন করেন, শিক্ষক ছাত্রকে শাসন করেন, রাজা প্রজাকে শাসন করেন—সর্ব্বত্রই সবল দুর্ব্বলকে শাসন করিতেছে। সকলেরই উদ্দেশ্য এক বা অভিন্ন। পাশ্চাত্য দার্শনিক Hugo Grotius যুদ্ধকে রাজনীতির

মূল· ধরিয়া বিচার করিয়াছেন। শান্তির উদ্দেশ্যেই যুদ্ধ, এবং কি প্রকারে যুদ্ধ চিরকালের জন্য স্থগিত রাখা যায় তাহার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।*

*"There are four kinds of war—between states—between an individual and the state—between different individuals—between the state and the individual.

1. When states declare war they have no right to abrogate the rights of the individual and the obligations of humanity. War must be conducted for the sake of peace and hence not in such a way as to make peace impossible. It is through this principle that *Grotius* became the founder of the modern theory of popular sovereignty.

2. When the individual declares war against the state, it is an act of rebellion ; and in evident opposition to *Althaus*, *Grotius* denies the right of the people to revolt.

3. War between individuals, in a well-regulated state, is limited to justifiable self-defence.

4. War of the state against the individual takes the form of punishment. The state's right to punish must not be construed as the right of expiation."

(*Hoffding's History of Philosophy, Edited by C. F. Sanders Ed. 1912 P. 13.*)

কিন্তু তাঁহার মতের প্রতিবাদ করা আবশ্যক মনে হয়। যুদ্ধে ব্যক্তিবিশেষের সত্ত্ব বা স্বাধীনতা বিপর্য্যস্ত হওয়া স্বাভাবিক, এবং প্রাকৃতিক নিয়মে যুদ্ধও অপরিহার্য্য। জগতে বৈষম্য আছে। সেই বৈষম্য দূর করিতে না পারিলে যুদ্ধের অবসান অসম্ভব। বৈষম্য জগতের মূল। বৈষম্য বিদূরিত হইলে জগৎ থাকে না। অতএব যতক্ষণ জগৎ আছে ততক্ষণ যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। যুদ্ধ করিতে হইলে ব্যক্তিবিশেষের সত্ত্ব বা অধিকার ভঙ্গ করিতেই হইবে। আর একটা বিষয় বলিয়াছেন, "obligations to humanity" মানব-সমাজের প্রতি দায়িত্ব ভঙ্গ করিতে পারিবে না। যুদ্ধে ব্যক্তিগত অধিকার ভঙ্গ করা যেমন আবশ্যক, মানব-সমাজের প্রতিও দায়িত্ব ভঙ্গ করাও তেমন আবশ্যক। যুদ্ধে শত্রুপক্ষের সৈন্যগণকে বিদলিত করা, শত্রুপক্ষের নির্য্যাতনের জন্য তাহাদের খাদ্যাদি লুণ্ঠন করা, বা তাহাদের রাজ্যে খাদ্যাদির আমদানি রপ্তানি বন্ধ করা—মানবসমাজের প্রতি দায়িত্ব ভঙ্গ করা ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। শত্রুর নিকট মিথ্যা খবর প্রচারিত করিয়া শত্রুকে বিপজ্জনক স্থানে লইয়া গিয়া তাহার বিনাশ সাধন করা, মানবের প্রতি দায়িত্ব ভঙ্গ করা

ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। নিজের দেশেও ব্যক্তিগত সুখ স্বাধীনতা ও অধিকার ভঙ্গ করা একান্ত দরকার। অতএব Grotiousএর কথার সমর্থন করা যায় না। আরও একটী বিষয় এ স্থলে বিবেচনা করিতে হইবে,—পরাধীন দেশের সম্বন্ধে Grotiusএর নিয়ম আদপেই প্রযোজ্য নহে। যদি বলা যায় ব্যক্তিগত স্বাধীনতার জন্য পরাধীনতা তাঁহার অনুমোদিত নহে, তাহা হইলে প্রথমতঃ তাঁহার মতের জন্য সকল দেশ, সকল জাতিকে স্বাধীন বলিয়া ধরিয়া নিতে হইবে। এই জন্যই Mill বলিয়াছেন, "Liberty is possible only in a free state." ব্যক্তিগত স্বাধীনতা স্বাধীন দেশেই সম্ভব। অতএব তাঁহার মত পরাধীন দেশের সম্বন্ধে খাটিল না। তিনি আরও বলিয়াছেন, সরকারের বিরুদ্ধে ব্যক্তিবিশেষের অভ্যুত্থান—বিপ্লব। তাহা কখনই সমাচীন নহে। এই বিষয়ও পরাধীন দেশ সম্বন্ধে প্রযোজ্য নহে। কারণ পরাধীন দেশের অভ্যুত্থান ব্যতিরেকে গত্যন্তর নাই। সেখানে William Tellএর অভ্যুত্থান, General Cossiusko, Kossuth, Washington, শিবাজি, রাণা প্রতাপের স্বাধীনতার চেষ্টা কখনই

দোষাবহ নহে, পরন্তু তাহা ধর্ম্ম। ম্যাটসিনি, গ্যারিবল্ডি, ক্যাভুর প্রভৃতির ইতালি উদ্ধারের চেষ্টা ধর্ম্ম। এই সমস্ত ক্ষেত্রে সকলেই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করিয়াছিলেন। Grotius বলেন জন-সাধারণের বিপ্লবের বা বিদ্রোহের অধিকার নাই। আবার Stateএরও ব্যক্তিবিশেষের স্বাধীন অধিকার ভঙ্গ করিবার অধিকার নাই। জনসমূহের ন্যায্য অধিকার যদি রাষ্ট্র (State) ভঙ্গ করেন, তাহা হইলে জনসমূহের কর্ত্তব্য কি? ব্যক্তিবিশেষ দিয়াই জনসমাজ গঠিত। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা মূল করিয়াই সাধারণ-তন্ত্র বা গণ-তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। যখন Gortius গণ-তন্ত্রবাদের প্রতিষ্ঠাতা, তখন তাঁহার পক্ষে উভয় বাক্যের সামঞ্জস্য রক্ষা করা উচিত ছিল, কিন্তু তাহা এখানে পরিলক্ষিত হয় না। পরাধীন জাতির স্বাধীনতার চেষ্টা ধর্ম্ম। আত্মপ্রকাশের চেষ্টাই জাতির স্বাধীনতার চেষ্টা। অতএব Grotius এর মত সর্ব্বাবগাহী নহে। ব্যক্তিগত (Subjective) বাস্তবত্ব ধরিয়া ব্যাখ্যা করিলে সকল বিষয়েরই সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়। পরশুরামের পিতৃবাক্যে মাতৃহত্যাও দোষাবহ নহে। কারণ তিনি যে মাতৃহত্যা করিয়াছেন,

তাহাতে তাঁহার মনে পিতৃআজ্ঞার বলবত্তাই সমধিক ছিল। শিক্ষক যখন ছাত্রকে শাসন করেন, তখনও Subjective। ছাত্র নিজের মঙ্গল বুঝিতে পারে না, কিন্তু শিক্ষক ছাত্রের মঙ্গল জানিয়া আত্মদর্পণে তাহা প্রতিফলিত করিয়া ছাত্রের সংশোধনের ব্যবস্থা করেন। রাজার শাসনও তাহাই, পিতার শাসনও তাহাই।

পরশুরামের মাতৃহত্যার মূলে তাঁহার পিতৃভক্তি ও পিতৃ-আদেশ-অনুবর্ত্তিতা। ব্যক্তিগত জীবনে যেমন, সামাজিক জীবনেও তেমনই। কোন প্রথা এক সমাজে অত্যন্ত দোষাবহ, আবার সেই প্রথাই অপর সমাজে হয় ত অনিন্দনীয়। সনাতন হিন্দু সমাজের মেয়ের পক্ষে বিধবা বিবাহের কথা কল্পনা করাও পাপ; কিন্তু পৃথিবীর প্রায় অন্য সকল সমাজেই বিধবাবিবাহ ধর্ম্মানুমোদিত। খৃষ্টান-সমাজে এক স্ত্রী বর্ত্তমান থাকিতে দ্বিতীয়বার বিবাহ করা অন্যায়; তাই অষ্টম হেনরী (Henry VIII) একাধিকবার স্ত্রীহত্যা করিয়া তাঁহার বিবাহের পথ পরিষ্কার করিয়াছিলেন। কিন্তু হিন্দু বা মুসলমান সমাজে ইহা ধর্ম্মানুমোদিত; এমন কি ১০০ শতের

অধিক বিবাহ করিয়াও তাহারা সমাজে বিশেষ নিন্দিত হইত না।

এই সব বাহ্য অসামঞ্জস্যের ব্যাখ্যা অসম্ভব। ব্যক্তিগত বাস্তবত্ব ধরিলে, বস্তুগত বাস্তবত্ব দ্বারা ইহার সমন্বয় সাধন সম্ভব না। সোক্রাটিস যে বলিয়াছেন—সত্য মিথ্যা, ন্যায় অন্যায়ের মানদণ্ড হইল জ্ঞান 'Knowledge is Truth' তাহারও অর্থ এই ব্যক্তিগত বাস্তবত্ব। তাঁহার মতে মানুষ জ্ঞানতঃ অসত্য বা অন্যায় আচরণ করে না। এখানেও তিনি ব্যক্তিগত বিচার বুদ্ধিকেই সত্য ও অসত্যের দ্বন্দ্বের মীমাংসক স্থির করিয়াছেন। আমাদের আত্মজ (innate) idea axiomই জ্ঞানের মূল। সর্ব্বত্রই ব্যক্তিগত বাস্তবত্ব দ্বারাই আমরা চালিত হই। তাই দেখিতে পাই কোনও স্থানে সত্যও মিথ্যার আকার ধারণ করে। আবার মিথ্যাও সত্যের আকার ধারণ করে। দস্যুর নিকট, লুক্কায়িত আশ্রিত ব্যক্তির বিষয় গোপন করা ও মিথ্যা বলা প্রকৃত প্রস্তাবে মিথ্যা হইলেও সত্যতুল্য। দেশ রক্ষা, ধর্ম্ম রক্ষা, স্ত্রী রক্ষা প্রভৃতির জন্য মিথ্যা বলাও ধর্ম্ম। মনুও বলিয়াছেন—

"তদ্বদন্ ধর্ম্মতোঽর্থেষু জানন্নপ্যন্যথা নরঃ।
ন স্বর্গাচ্চ্যবতে লোকাদ্দৈবীং বাচং বদন্তি তাম্॥" ৮।১০৩

অর্থাৎ লোক দয়াদির জন্য এক প্রকার জানিয়া ধর্ম্মবুদ্ধিতে অন্যপ্রকার বলিলে স্বর্গভ্রষ্ট হয় না। উহা দৈবী বাক্য, অর্থাৎ দেবগণেরও অনুমোদিত। মনু আরও বিশেষ করিয়া দেখাইয়াছেন—

শূদ্রবিট্ক্ষত্রবিপ্রাণাং যত্রর্ত্তোক্তৌ ভবেদ্বধঃ।
তত্র বক্তব্যমনৃতং তদ্ধি সত্যাদ্বিশিষ্যতে॥" ৮।১০৪

যে বাক্যদ্বারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্রের প্রাণ নষ্ট হয়, সে স্থলে মিথ্যাই বক্তব্য। কারণ সে ক্ষেত্রে সত্য হইতেও মিথ্যা প্রশস্ততর।

দয়া ধর্ম্ম, সত্যও ধর্ম্ম, জীবকে রক্ষা করাও ধর্ম্ম। কোনও গাভী পঙ্কে নিমগ্ন হইয়াছে, তাহাকে উদ্ধার করিবার জন্য রজ্জু দ্বারা আকর্ষণ করা আবশ্যক। রজ্জু দ্বারা আকর্ষণ করাতে গাভীর মৃত্যু হইল। এক্ষেত্রে উদ্ধারের জন্য চেষ্টিত ব্যক্তির কোনও দোষ হইতে পারে না। কোনও চিকিৎসক রোগীকে রোগমুক্ত করিবার জন্য ঔষধ প্রয়োগ করিল, কিন্তু রোগী আরোগ্যলাভ না করিয়া মরিয়া গেল। এক্ষেত্রে

চিকিৎসকের কোন দোষই হইতে পারে না। দার্শনিক সত্য আবিষ্কার করিয়া সাধারণ্যে প্রচার করিলেন। জীবের মঙ্গলের জন্যই সত্যের প্রচার। কিন্তু লোকে তাহার ফলে যুদ্ধবিগ্রহাদির সৃষ্টি করিল। এরূপ ক্ষেত্রে দার্শনিকের কোনও দোষই হইতে পারে না। কোনও দেশে বিধবার বিবাহ ধর্ম্মানুমোদিত, সে দেশের লোক তাহা করিয়া কখনও অনুতপ্ত হয় না। কোন দেশে বৃদ্ধ পিতাকে গৃহের ছাদে উঠাইয়া দেয়। বৃদ্ধ সেখান হইতে পড়িয়া গেলে তাহার মাংস সকলে খায়। তাহাদের যুক্তি এই যে, বৃদ্ধের বাঁচিয়া কোনও ফল নাই, কারণ সে সংসারের বোঝা। ঘোড়া রোগে ভুগিতেছে, তাহাকে যুদ্ধের সময় বহন করা অতীব কষ্টকর। এমন কি অনেকগুলিকে রক্ষা করিতে হইলে নিজেদের ধৃত হইবার সম্ভাবনা। এমতাবস্থায় ঘোড়াগুলিকে ত্যাগ করা, এমন কি আহত মনুষ্যকেও ত্যাগ করা বিধি। সত্যমিথ্যার মাপ-কাঠিও তেমনই। দস্যু ধন অপহরণ করিতে আসিয়াছে। দস্যু ধন নিয়া অসদাচরণে নষ্ট করিবে, এমতাবস্থায় মিথ্যা বাক্য দ্বারা ধন রক্ষা করাই বিধেয়। যুধিষ্ঠির কর্ণের

নিকট বার বার পরাজিত হন। অর্জ্জুন যুদ্ধ হইতে ফিরিয়া আসিলে অপমানিত যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনকে তিরস্কার করেন এবং গাণ্ডীব ধনু ত্যাগ করিতে বলেন। অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা ছিল, কেহ গাণ্ডীব ত্যাগ করিতে বলিলে তাহাকে হত্যা করিবেন। তিনি যুধিষ্ঠিরকে বধ করিতে উদ্যত হইলেন। তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে সকল উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহাতেও তিনি এই সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ্বের নিষ্পত্তি করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "সত্যই বক্তব্য, কিন্তু কোনও স্থলে মিথ্যাই সত্যের আকার ধারণ করে। সে স্থলে মিথ্যা বলাই উচিত। মনু এই জন্যই বলিয়াছেন, "সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ ন ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্"। সত্য অর্থ ভূত-হিত; যাহাতে প্রাণি-গণের মঙ্গল না হয়, এমন বাক্য সত্য হইতে পারে না। এই জন্যই ভগবান্ গীতায় বাঙ্ময় তপস্যা সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়ং হিতং চ যৎ।
স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে॥" ১৮।১৫

প্রাণিগণের অনুদ্বেগকর, সত্য, শ্রুতিসুখকর, হিত

(মঙ্গলকর পরিণামে পথ্য) এরূপ বাক্যাভ্যাস এবং স্বাধ্যায় বেদ-পাঠাদি বাঙ্ময় তপস্যা।

কেবল সত্যবাক্য হইলেই হইবে না, প্রাণিগণের মঙ্গলজনক হওয়াও চাই, শ্রুতিকটু না হয়, প্রাণিসমূহের উদ্বেগের সৃষ্টি না করে—এমন বাক্যই প্রকৃত সত্য-বাক্য। ইহার ভাষ্যে ভগবান্ শঙ্কর লিখিয়াছেন---"অনুদ্বেগকরং প্রাণিনামদুঃখকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়ং হিতঞ্চ যৎ। প্রিয়হিতে দৃষ্টাদৃষ্টার্থে। অনুদ্বেগ-করত্বাদিভিঃ ধর্ম্মৈ বাক্যং বিশিষ্যতে। বিশেষণ-ধর্ম্মসমুচ্চয়ার্থশ্চশব্দঃ পরপ্রত্যায়নার্থং প্রযুক্তস্য বাক্যস্য সত্যপ্রিয়হিতানুদ্বেগকরত্বাদিনামন্যতমেন দ্বাভ্যাং ত্রিভির্বা হীনতা স্যাদ্ যদি, ন তস্য বাঙ্ময়তপস্ত্বম্। তথা সত্য বাক্যস্যেতরেষামন্য-তমেন দ্বাভ্যাং ত্রিভির্ব্বাহীনতায়াং ন বাঙ্ময়তপস্ত্বম্। তথা প্রিয়বাক্যস্যপীতরেষামন্যতমেন দ্বাভ্যাং ত্রিভির্হীনস্য ন বাঙ্ময়তপস্ত্বম্। তথা হিতবাক্য-স্যাপীতরেষামন্যতমেন দ্বাভ্যাং ত্রিভির্বা বিযুক্তস্য ন বাঙ্ময়তপস্ত্বম্। কিং পুনস্তপঃ? যৎ সত্যং বাক্যমনু-দ্বেগকরং প্রিয়ং হিতং চ যৎ, তৎ পরমং তপো বাঙ্ময়ম্। যথা---শান্তো ভব বৎস! স্বাধ্যায়ং যোগং বাগনুতিষ্ঠ

তথা তে শ্রেয়ো ভবিষ্যতি।*" অতএব বাক্যটি কেবল সত্য হইলেই হইল না, তাহা প্রিয় এবং মঙ্গল-জনক হওয়া আবশ্যক। অন্যত্র ভগবান্ শঙ্কর লিখিয়াছেন,---

"লোকোদ্বেগকরী যা চ যা চ কর্ম্মনিকৃন্তনী।
স্থিত্যুচ্ছেদকরী যা চ তাং গিরং নৈব ভাষয়েৎ॥"

সত্যবাক্য হইলেও যাহাতে লোকের উদ্বেগ উপস্থিত হয়, যাহাতে আরব্ধ কার্য্য নষ্ট হয়, যাহাতে স্থিতির উচ্ছেদ হয় এরূপ বাক্য বলিবে না।

আবার সত্যের লক্ষণ যদি "যথাদৃষ্টবচনং" হয়, তাহা হইলে "অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ" বাক্যও সত্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে; বক্তার উদ্দেশ্যও সত্যবাক্যের সহিত জড়িত। শ্রুতিতে ইহার বিশিষ্ট প্রমাণ দেখিতে পাই; "বাঙ্মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা মনো মে বাচি প্রতিষ্ঠিতম্" (ঋগ্বেদীয় শান্তিমন্ত্র)—বাক্য মনে প্রতিষ্ঠিত হউক, এবং মন বাক্যেতে প্রতিষ্ঠিত হউক। বক্তার মন সম্পূর্ণরূপে বাক্যেতে প্রতিষ্ঠিত না হইলে তাহা কখনই সত্য হইতে পারে না, তাহা Half-

* প্রপঞ্চসার, ৩৩ পটল।

truths বা অৰ্দ্ধসত্য। যেমন প্রভুর ভয়ে ভৃত্য স্বীকার করে---"আপনাকে ভালবাসি।" ভৃত্য প্রভুকে একেবারে যে ভালবাসে না এরূপও নহে, আবার যে খুব বেশী ভালবাসে তাহাও নহে। মানবের ব্যবহারে এই Half-truths বা অৰ্দ্ধসত্যই বহুল দৃষ্ট হয়। শিক্ষক ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"পড়েছিস্" ? ছাত্র উত্তর করিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ"। বাস্তবিক শিক্ষকের জিজ্ঞাস্য ও ছাত্রের উত্তরের মধ্যে এখানে অনেক সত্য গোপন থাকে। রাজ-শাসনে নিয়ন্ত্রিত হইয়া সত্যবাক্য অৰ্দ্ধ-সত্যরূপে ব্যবহৃত হয়। স্বামী স্ত্রীকে বলে---"তোমাকে প্রাণ অপেক্ষা বেশী ভালবাসি।" বাস্তবিক, কথাটি আদপেই সত্য নহে। প্রাণকে ভালবাসি বলিয়াই স্ত্রীকে ভালবাসি, আমাকে ভালবাসি বলিয়াই স্ত্রীকে ভালবাসি। পত্রে লিখি—"তোমার পত্র না পাইয়া চিন্তিত ছিলাম, পত্র পাইয়া আকাশের চাঁদ হাতে পাইলাম।" কথাটা অৰ্দ্ধসত্য। ভগবদ্ বিষয়ক সঙ্গীত গান করিতেছি,—"তোমাকেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা" "তুমি সকলি আমার।" বাস্তবিক এই কথাগুলি সত্য নহে কিন্তু অৰ্দ্ধসত্য। তোমাকে আমার জীবনের লক্ষ্য করিতে চাই—তাহাও বলিতে

পারি না। কারণ, নানা বিষয়ে লক্ষ্য পড়ে, প্রাণে একটু ইচ্ছাও আছে, আবার তাহার মূলে কখনও প্রচ্ছন্ন প্রতিপত্তি-লাভের বাসনাও আছে। "তুমি সকলি আমার" ইহা ভাবিবার বা করিবার বাসনা আছে। কিন্তু তুমিই আমার সকল, ইহা হয় নাই। অতএব জগতের ব্যবহারে অর্দ্ধসত্যই চলিতেছে। অদ্য যাহা সত্য বলিয়া ধারণা করিলাম, আগামী কল্য কোনও মনীষাসম্পন্ন দার্শনিকের বাক্যে তাহা মিথ্যা বলিয়া বোধ হইল। তৎপর দিন আবার অন্য কোনও দার্শনিকের বাক্যে তাহা বিপর্য্যস্ত হইল। সত্যটি অসন্দিগ্ধ হওয়া আবশ্যক।

এ ক্ষেত্রেও সত্যের উপলব্ধি বাহির হইতে হয় না। উহার objective reality নাই, ইহাই প্রতীত হয়। বাস্তবিক এগুলি অর্দ্ধসত্য। Theory গুলিও অর্দ্ধসত্য। "Vox populi vox dei" এই বিষয়টীও এই স্থানে বিশেষরূপে আলোচিত হইতে পারে। সাধারণের বাক্য ভগবৎ বাক্য, অতএব উহা সত্য-বাক্য। কিন্তু তাহা কখনই হইতে পারেনা। জনসাধারণ কোনও মেধাবী ব্যক্তির যন্ত্র। মেধাবী ব্যক্তি যে মতটি সত্য বলিয়া তাঁহাদের নিকট প্রচার

করেন, তাঁহারা তাহাই ধরিয়া বসে, তাঁহাদের প্রকৃত পক্ষে কোনও Voice বা মত নাই। চিন্তা বা বিচার করিবার সুবিধা বা ইচ্ছা তাঁহাদের নাই। তাঁহারা ভাবের বশেই অনেক জিনিষ গ্রহণ করে। ভাব বা Emotion অনেক সময় সত্যটিকে আবৃত করিয়া রাখে। ক্রোধের সময় যাহা সত্য বলিয়া বোধ হয়, এবং ক্রোধের বশে যাহা করি, তাহা কখনই সত্য বা ধর্ম্ম হইতে পারে না। বিদ্বেষের বশে যাহা করা হয়, তাহা কখনই সত্য হইতে পারে না। কামের বশে যাহা করি, বাসনার তাড়নায় যাহা করি, তাহা কখনই অনুমোদিত হইতে পারে না—সত্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। জনসাধারণ ভাবের আতিশয্যে কোনও বিষয়কে সত্য বলিয়া ধারণ করে, অতএব 'Vox populi vox dei' এই বাক্যের সার্থকতা নাই। দেশের জনসাধারণ Conscription বা বাধ্যতামূলক সৈন্য-শ্রেণীভুক্ত হইতে চায় না। কিন্তু শিক্ষিত ব্যক্তিরা তাহার আবশ্যকতা উপলব্ধি করিতেছেন। এমতাবস্থায় জনসাধারণের বাক্য উপেক্ষা করিয়া বাধ্যতামূলক আইনই বিধিবদ্ধ হয়। Democracy বা গণতন্ত্র প্রকৃত প্রস্তাবে Oligarchy অর্থাৎ শিক্ষিত কয়েক

ব্যক্তির বা প্রবল শক্তিশালী ব্যক্তির শাসন; এবং অনেক ক্ষেত্রে Timocracy বা ধনবান্ লোক সমূহের শাসন। যে কোনও কার্য্যকরী (Executive) ব্যাপার শক্তিশালী ব্যক্তির উপর নির্ভর করে। প্রতিনিধি নির্ব্বাচন বা Representation অর্থও শক্তিশালীর নিয়োগ। বোধহয় দার্শনিক Nietzsche এই জন্যই এরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন।*

সাধারণতন্ত্রবাদী ও সমাজতন্ত্রবাদীর কথা ও কার্য্যের সামঞ্জস্য থাকে না ফরাসী-বিপ্লবের সময় মিরবো প্রভৃতি যে দোষ নিরাকরণ করিবার জন্য শাসন-ভার গ্রহণ করিলেন, তাহার অনুষ্ঠানে নিজেরাই হস্ত রক্তে কলঙ্কিত করিলেন। গণতন্ত্রবাদী ও সমাজতন্ত্রবাদী

*The great mass of mankind is nothing more than an instrument, obstacle or copy. A higher, ruling caste is necessary, which exists for its own sake,—which is an end in itself, not at the same time an instrument. Corruption begins just as soon as the aristocracy no longer believe in their right to live, to rule and to treat the great masses as their laboring cyclops.

(*Hoffding's History of Philosophy, Edited by C. F. Sanders, Ed. 1912 P. 308.)*

ব্যক্তিবিশেষের স্বাধীনতার উৎকর্ষ স্থাপনের জন্যই গণতন্ত্রের মত প্রতিষ্ঠা করিলেন। তিনিই আবার নিজের মতের অধীনতায় সাধারণকে আনিবার জন্য ব্যাপৃত। রাজ-শাসনে ব্যক্তিবিশেষের স্ফুরণ বা ক্রমবিকাশ হইতে পারে না, এই অজুহাতে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। কিন্তু গণতন্ত্রও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ব্যক্তিবিশেষের ক্রমবিকাশের পথ রুদ্ধই করিতেছে। উভয় পক্ষের নির্ব্বাচনে উনিশ বিশ হইলে, বিশের জয়, ইহাও ব্যক্তিবিশেষের উৎকর্ষের পরিপন্থী। জনসাধারণের মতেরই বা মূল্য কি? উনিশ এবং বিশ জনের পার্থক্য ধরিয়া কোন্‌টী জনসাধারণের মত, তাহা গ্রহণ করা যাইতে পারে না। আর, বক্তৃতা দ্বারা মত গঠনও ব্যক্তিবিশেষের ক্রমবিকাশের ও সাধারণের মতের (popular voice) বিরোধী।

বেশী ট্যাক্‌স দেওয়ার দৃষ্টান্ত আমরা পূর্ব্বেই দিয়াছি। সে ক্ষেত্রেও জনসাধারণ ভয়ের জন্যই ট্যাক্‌স দিতে রাজি হয়, কিন্তু স্বচ্ছন্দে নহে। সে ক্ষেত্রেও Popular will বা সাধারণের ইচ্ছার কোনও মূল্য থাকে না। আমাদের বিশ্বাস, যাহারা যত সাধারণ-তন্ত্রবাদী, (Republican) তাহারাই, তত যথেচ্ছা-

চারিতার (Autocracy বা Absolute power) পক্ষপাতী। উহাদের মতে ও কার্য্যে আস্‌মান জমিন ফারাক্‌। ভাবতরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাতে যাহার চিত্ত চঞ্চল, তাহার পক্ষে সত্য নির্দ্দেশ অসম্ভব। সত্য নির্দ্দেশ করিতে পারেন তিনি, যাঁহার চিত্তের চাঞ্চল্য নাই, মতের ব্যতিক্রম নাই। হস্তীদর্শনের ন্যায় যাহাদের জ্ঞান * তাহাদের পক্ষে সত্য নির্ণয় অসম্ভব; কারণ ধর্ম্মের গতি 'অতি সূক্ষ্ম। চিত্ত নির্ম্মল হইলে তাহাতে যে সত্য প্রতিভাত হয়, তাহাই মানবের কল্যাণে নিয়োজিত হয়—"ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্‌।" এই উদ্দেশ্যে আপস্তম্ব ধর্ম্মসূত্রে লিখিত আছে—

* কতকগুলি অন্ধব্যক্তি হস্তী স্পর্শ করিয়া হস্তীর ভিন্ন ভিন্ন আকার স্থির করিল। যে ব্যক্তি পাদস্পর্শ করিয়াছে, সে বলে—হস্তী 'স্তম্ভাকার', যে শুণ্ড স্পর্শ করিল, তাহার মতে—হস্তী 'সর্পাকার,' যে উদর স্পর্শ করিল, সে বলে—হস্তী 'একটী প্রকাণ্ড ঢাকের মতন'; যে ব্যক্তি লেজ ধরিয়াছিল, সে বলিল—হস্তী 'গো-পুচ্ছ সদৃশ'; যে কর্ণ স্পর্শ করিয়াছে, তাহার মতে—হস্তী 'কুলার ন্যায়'। এই প্রকার স্ব স্ব মত প্রতিষ্ঠার জন্য অন্ধগণ পরস্পর ঘোরতর বাদ-প্রতিবাদ আরম্ভ করিল; এই সময়

"যত্ত্বার্য্যাঃ ক্রিয়মাণং প্রশংসন্তি
স ধর্ম্মো যদ্ গর্হন্তে সোঽধর্ম্মঃ"। (১।৭।২০।৭)

আর্য্য অর্থাৎ শিষ্ট ব্যক্তিগণ যাহার প্রশংসা করেন, তাহা ধর্ম্ম এবং যাহার নিন্দা করেন তাহা অধর্ম্ম।

"সর্ব্বজনপদেষ্বেকান্তসমাহিত-
মার্য্যাণাং বৃত্তং সম্যগ্ বিনীতানাং।
বৃদ্ধানামাত্মবতামলোলুপানাম-
দাম্ভিকানাং বৃত্তসাদৃশ্যং ভজেত॥" (১।৭।২০।৮)

যাঁহারা গুরুর নিকট হইতে বিদ্যা লাভ করিয়াছেন, যাঁহারা জ্ঞানবৃদ্ধ, যাঁহারা জিতেন্দ্রিয়, তত্ত্বার্থদর্শী,

---

চক্ষুষ্মান্ একব্যক্তি তথায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন—"তোমরা প্রকৃত দর্শনশক্তির অভাবনিবন্ধন অনর্থক বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছ। আমি তোমাদের বিবাদ-ভঞ্জন করিয়া দিতেছি। তোমরা প্রত্যেকেই হাতীর অঙ্গবিশেষ স্পর্শ করিয়াছ—কেহই সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অনুসন্ধান করিয়া উহার প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে পার নাই। তোমরা যে যাহা বলিতেছ তাহা ঠিক বটে; কিন্তু একজাতীয় একটী বস্তু নানাপ্রকার হইতে পারে না। ঢাকের ন্যায় হস্তীর উদর, কুলার মত কাণ, স্তম্ভসদৃশ পদ, সর্পাকার উহার শুঁড় ইত্যাদি, এতাদৃশ স্বরূপ হস্তীজাতি জানিও।"

যাঁহারা অকৃপণ, যাঁহারা ধর্ম্মধ্বজী নহেন, এইরূপ আর্য্যগণের যাহা একান্তরূপে অনুমোদিত তাহাই ধর্ম্ম-বৃত্ত। ভগবান্ গীতায়ও ইহাই বলিয়াছেন—

"যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামকারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥ (১৬৷২৩)
তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্মকর্ত্তুমিহার্হসি॥ (১৬৷২৪)...

শাস্ত্র ঋষি-বাক্য বলিয়াই গ্রাহ্য, ঋষিগণ গুরু-পরম্পরাক্রমে জ্ঞানলাভ করিয়াছেন। যাহারা গুরুর নিকট হইতে বিদ্যালাভ না করে, তাহারা প্রায়শঃই অহঙ্কারী ও দাম্ভিক হয় এবং প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করিতে পারে না। ঋষিরা অকৃপণ স্বভাব। তাঁহারা জিতেন্দ্রিয়, বীর্য্যবন্ত, সবল। তাঁহারা সবল বলিয়াই তাঁহাদের বাক্য গ্রহণীয়। যোগীর অন্তর-দর্পণে সত্য প্রতিভাত হয়। অতএব যোগীর বাক্যই সত্যবাক্য। মন ও মুখ এক না হইলে সত্যবাক্য হয় না। চাটুকারের, কৃপণ্ স্বভাবের, লোভীর বাক্য কখনই সত্য হইতে পারে না। দুর্ব্বল পরাধীন কখনই সত্যবাক্য বলিতে না। পরপিণ্ডলেহী, অধীন ব্যক্তির সত্য সম্ভব নহে।

এখন সত্য মিথ্যার সম্বন্ধে আরও একটী কথা বলিব, "ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনঃ" ভগবান্ ভাবগ্রাহী। এই কথাটিতে আমাদের Subjective realityই সাব্যস্ত হয়। সত্য ও মিথ্যা বাস্তবিক Subjective, objective হিসাবে উহার নির্দ্দেশ হইতে পারে না। ইহা আমরা পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন করিয়াছি। এই জন্যই ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন, "সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।" কর্ম্ম বা ধর্ম্ম Subjective, সুতরাং সহজ, স্বভাবজাত, প্রকৃতিগত। বাহিরের মাপকাঠি দিয়া উহার নির্দ্দেশ চলে না। ভগবান্ স্পষ্ট করিয়াই উহা বলিয়াছেন—

"শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্॥ ১৮।৪৭

সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।
সর্ব্বারম্ভাহি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ॥" ১৮।৪৮

ভগবান্ আরও বলিয়াছেন, "স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ।" যুদ্ধের সময় মিথ্যাও সত্য হয়, হিংসাও অহিংসা হয়। যুদ্ধ যজ্ঞ, যুদ্ধ ধর্ম্ম; যুদ্ধের প্রবঞ্চনা, শঠতাও ধর্ম্ম। মনু বলিয়াছেন—

"উপরুধ্যারিমাসীত রাষ্ট্রঞ্চাস্যোপপীড়য়েৎ।
দূষয়েচ্চাস্য সততং যবসান্নোদকেন্ধনম্॥" ৭।১৯৫

শত্রুকে অবরুদ্ধ করিয়া লুণ্ঠনাদির দ্বারা তাহার রাজ্য উৎপীড়িত করিবে এবং সর্ব্বদা পশুর খাদ্য ঘাস অগ্নি-প্রদানে নষ্ট করিবে।

অন্নের আমদানি রপ্তানি বন্ধ করিবে, বিষ প্রদানেও অন্ন দূষিত করিবে, জল বিষ দ্বারা নষ্ট করিবে, জ্বালানি কাষ্ঠ অগ্নি প্রদানে নষ্ট করিবে।

"ভিন্দ্যাচ্চৈব তড়াগানি প্রাকার-পরিখাস্তথা।
সমবস্কন্দয়েচ্চৈনং রাত্রৌ বিত্রাসয়েত্তথা।" ৭।১৯৬

প্রাকার, পরিখা ও জলাশয় সকল ভগ্ন করিয়া দিবে, যেন জলাভাবে তাহারা বিপদ্‌গ্রস্ত হয়। গোপনে শত্রুকে হত্যা করিবে এবং রাত্রিতে নানাবিধ উপায় দ্বারা উহাদিগকে বিত্রাসিত করিবে।

মনু ইহা হইতেও স্পষ্টরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—যখন সাম, দান ও ভেদ এই তিন উপায়ে সম্ভব হইবে না, তখন যে কোনও উপায়ে হউক, শত্রুকে নির্য্যাতন করিবে—

"ত্রয়ানামপ্যুপায়ানাং পূর্ব্বোক্তানামসম্ভবে।
তথা যুধ্যেত সংযত্তো বিজয়েত রিপূন্ যথা॥" ৭।২০০

যে কোনও প্রকারেই হউক, বঞ্চনাদি দ্বারাও শত্রুকে পরাজিত করিবে।

ইউরোপে Machiavelliকে তাচ্ছীল্য করার হেতু নীতির দাসত্ব। Machiavelliর কথার ভিতরে প্রচ্ছন্ন শক্তি রহিয়াছে। সমস্ত ইটালিকে একত্র সংবদ্ধ করিতে তাঁহার সমস্ত চিন্তা একটা আদর্শের দিকে প্রধাবিত হইয়াছিল। দুর্দ্দশাগ্রস্ত ইটালিকে পূর্ণতায় দেখিবার জন্যই রাজনৈতিক চিন্তার, Ideal বা আদর্শের দিকেই বেশী জোর দিয়াছেন। *

* Why should we imitate the splendid arts of the ancients and neglect their splendid deeds? But the sole possibility of accomplishing anything great requires us to press forward to the realization of great ideals without scruple! * * * * But in the background of his thought there was constantly but a single ideal, the unity and greatness of Italy. He regarded everything right which would contribute towards the realization of this ideal.

Hoffdings's History of Philosophy C. F. Sanders' Ed. of 1912. P. 6.

Machiavelli যে দিক দিয়াই দেখুন না কেন, বাস্তবিক লক্ষ্যের উপরেই উপায়ের নির্ভর। চিকিৎসক এক অঙ্গ কাটিয়া ফেলিয়াও শরীর রক্ষার ব্যবস্থা করেন। সমাজে ব্যক্তিবিশেষের ফাঁসি দেওয়া হয়, এক্ষেত্রেও উদ্দেশ্যের বা লক্ষ্যের দিকে নজর রাখিয়া ব্যবস্থা করা হয়। বোধহয় আইনের দার্শনিক ভিত্তি ঐ স্থানেই। Jurisprudence বা আইনেব দর্শন ইহার অতিরিক্ত আর কিছুই বলিতে পারে না। Roman Lawএর মূল ভিত্তিও ঐ উদ্দেশ্যের উপরে স্থাপিত। সংসারের যাবতীয় ব্যবহারই উদ্দেশ্যের উপরে ব্যবস্থিত। এই জন্যই বলা হয় "End justifies the means"। উদ্দেশ্য Subjective (ব্যক্তিগত) বলিয়াই "End justifies the means" এই মত স্থাপন করা চলে। শান্তিই যুদ্ধের লক্ষ্য বলিয়া যুদ্ধের মিথ্যা, হিংসা প্রভৃতির সমর্থন করিতে হয়। যাহারা নীতির দোহাই দেয়, তাহারা অনেক ক্ষেত্রেই Pecksniff (বক ধার্ম্মিক); অসরলতাই তাহাদের আশ্রয়। নৈতিক দাসত্বে মানুষকে ভণ্ড করিয়া তোলে, সে বিড়াল বা বক-ব্রতী হইয়া দাঁড়ায়। সংসারের ব্যবহারে নৈতিক আদর্শ (Moral idealism) একরূপ অসম্ভব।

সন্ন্যাসীর মানদণ্ডে সাধারণ লোককে মাপিতে নাই। যিশু সন্ন্যাসীর জন্য ভাবের ধর্ম্ম প্রচার করিলেন। নৈতিক ভাবের প্রাধান্য হইলে "Keep no thought for the morrow" প্রভৃতি সন্ন্যাসীর উপদেশ দিলেন। কিন্তু তাঁহার পরবর্ত্তী উপদেষ্টাগণ অধিকারী নির্ব্বিশেষে উপদেশ দেওয়াতে খৃষ্টান ধর্ম্মের উপরে পরবর্ত্তী চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের আক্রমণ অপরিহার্য্য হইয়া উঠিল। বৌদ্ধ ধর্ম্মের নৈতিক আদর্শও এইরূপেই অভিচারে পরিণত হইয়াছিল।

সকল বিষয় ত্যাগ করা যাইতে পারে, কিন্তু Principle বা আদর্শ ত্যাগ করা অত্যন্ত কঠিন। যিনি গণতন্ত্রবাদী, তিনি লোককে মতের দাসত্বে নিয়োজিত করেন; এবং নিজের মতে সকলকে নিতে চেষ্টা করেন। ইহা অপেক্ষা বেশী অত্যাচার বোধহয় আর নাই। নির্দ্দিষ্ট দশটি আদেশ মানিতেই হইবে, মতের স্বাধীনতা কিছুই থাকিবে না, এইরূপে জ্ঞানের শক্তিকে নিরুদ্ধ করিবার মতন অত্যাচার আর কিছুই নাই। হিন্দুসমাজে চার্ব্বাকও হিন্দু, বুদ্ধও অবতার, কপিলও ঋষি। কিন্তু খৃষ্টান সমাজে Socrates, Galeleo, Bruno, Kant প্রভৃতি সকলকেই মতের জন্য শাস্তি

ভোগ করিতে হইয়াছে। মতের দাসত্বের জন্য Spanish Inquisition এর মত লোমহর্ষণ ঘটনা ইউরোপে সম্ভব হইয়াছে। নৈতিক দাসত্বের কারণ ইউরোপের objective Philosophy এবং খৃষ্টান ধর্ম্ম। বাহির হইতে যাহারা দেখেন, তাহারা নূতন মত প্রবর্ত্তনায় বড়ই ভয় পান। কিন্তু যাহারা অন্তরের দিকে দৃষ্টিসম্পন্ন, তাহারা পরিষ্কাররূপে জানেন যে, নূতন মত যদি আন্তর প্রকৃতির অনুকূল না হয়, তাহা কখনই প্রচারিত, প্রসারিত হইতে পারিবে না। কয়েক দিনের জন্য থাকিয়া সুপ্ত লুপ্ত হইয়া যাইবে। আন্তরিক দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি আচারে বাঁধে, বিচারে স্বাধীনতা দেয়। বাহিরের দিকে ব্যবহার সংযত রাখে, কিন্তু মতের বা অন্তরের স্বাধীনতা দেয়। নৈতিক দাসত্বে মানুষ জড় হইয়া যায়। যাহাদের জীবনে "অমৃতস্য পুত্রাঃ" এই বোধ না থাকে, তাহারাই এক প্রকার সঙ্কুচিত ধাতের হইয়া পড়ে। সকল পাপ পরমাত্মায় আহুতি দিয়াছি, আমি নিষ্পাপ—এরূপ যাহার বোধ নাই, তাহাকে শত নৈতিক বন্ধনে বদ্ধ করিলেও তাহার খুঁতখুঁতে ভাব কিছুতেই যাইবে না। কর্ত্তব্য বা নীতির সার্থকতা ব্যক্তিগত দিক দিয়া। এই জন্যই রামচন্দ্রের স্ত্রী-

পরিত্যাগ যুক্তিযুক্ত। ব্যক্তিগত দিকে—রাজধর্ম্ম ও স্ত্রীর প্রতি কর্ত্তব্যের বিচার চলিল। রামচন্দ্র দেখিলেন রাজার কর্ত্তব্যই তাঁহার পক্ষে সবচেয়ে বড়। তাই সীতাকে বর্জ্জন করিলেন। মনুও বলিয়াছেন—রাজার অবধ্য অর্থাৎ শাসনের অযোগ্য কেহই নাই। রাজা সকলকেই শাসন করিতে পারেন।

"পিতাচার্য্যঃ সুহৃন্মাতা ভার্য্যা পুত্রঃ পুরোহিতঃ।
নাদণ্ড্যোনাম রাজ্ঞোঽস্তি যঃ স্বধর্ম্মে ন তিষ্ঠতি॥"

যদি কেহ বলেন যে, সীতার কোনও অপরাধ না থাকা সত্ত্বেও তাঁহাকে বর্জ্জন করা হইল কেন? তদুত্তরে বলা যাইতে পারে যে প্রজারঞ্জনই রাজার কর্ত্তব্য; প্রজার জন্য স্ত্রী-পরিত্যাগও রাজধর্ম্ম। কবির ভাষায় একটি কথা এক্ষেত্রে বলিতে ইচ্ছা হয়—

"প্রভুর ধর্ম্মে বীরের কর্ম্মে বিরোধ মিটাতে আজ।
দুর্গ দুয়ারে পড়িয়া রহিল দুর্গেশ দুমরাজ॥

বাস্তবিকই কর্ত্তব্যের মানদণ্ড ভিতরে। যখন দুইটি সম পরিমাণের কর্ত্তব্য আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন ব্যক্তিত্বই উহার নিক্তি। অন্য কোনও মানদণ্ডই উহার নির্দ্ধারণে সক্ষম নহে। ব্যক্তিত্বই সবলতা, সবলতাই

প্রকৃত প্রস্তাবে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে মানদণ্ড। অত্যাচার হইতে রক্ষা করা ধর্ম্ম। উভয় পক্ষ যখন যুধ্যমান, তখন এক পক্ষের দ্বেষ বেশী হইবেই। এক পক্ষ যথেচ্ছাচারী হইলে অপর পক্ষ বাধ্য হইয়াই যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। এক্ষেত্রেও ব্যক্তিগত দিক দিয়াই বিচার সম্ভব। উভয় পক্ষই জাতীয় জীবন রক্ষার জন্য চেষ্টিত। বাহিরের দিক দিয়া বিচার হইতে পারে না। কেবল জিদের বশে যুদ্ধ করিলে তাহা নিজের চিত্তের মাপকাঠিতে ধরা পড়িবে। বাহিরের লোককে চোখ ঠার দিয়া বুঝান যায়, কিন্তু নিজের অন্তরকে ফাঁকি দেওয়া চলে না। দানের সম্বন্ধেও এই নিয়ম। দাতার অভিমানে দানের ফল হয় না। "Virtue is its own reward" পুণ্যই পুণ্যের পুরস্কার। এ কথাটির তাৎপর্য্য বোধ হয় চিত্তশুদ্ধিতে। পুণ্যকার্য্যে চিত্ত শুদ্ধ হয়, নির্ম্মলতা লাভ করে। আকাঙ্ক্ষা না করিলেও কার্য্যের ফলেই ওরূপ হয়। বাস্তবিক পুণ্যের ভিতরে অনেক সময় মান, যশ, প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা থাকে, তাহা না থাকিলেই পুণ্যের ফলে চিত্তশুদ্ধি হয়। পরোপকারের অর্থ নিজের উপকার। পরোপকারে যে আত্মপ্রসাদ লাভ হয়, তাহার মত নিষ্কাম লাভ আর কিছুই হইতে পারে না।

পরোপকারের মূল তাৎপর্য্য, নিজের অন্তঃকরণের উন্নতি। অতএব যাহারা "পরোপকার পরোপকার" বলিয়া আস্ফালন করেন, তাহারা প্রকৃত প্রস্তাবে সূক্ষ্মদর্শী নহেন। এ বৃহৎ সংসার আত্মার কল্যাণ কামনায়ই সকলে ব্যবহার করিতেছে। কেহ স্থূলের জন্য, কেহ সূক্ষ্মের জন্য। এই মাত্র তফাৎ।

স্থূলের জন্য হইলে উহাকে স্বার্থপরতা বলা হয়। সেই সুরে সুর মিলাইয়া নীতিবাদী সূক্ষ্মের জন্য বাসনাকেও স্বার্থপরতা বলিয়া বসেন। আমাকে আমি চাই, ইহাতে বাসনা বা স্বার্থপরতা কোথায়? আমার প্রকৃত স্বরূপে আমি থাকিব, ইহাতে স্বার্থপরতা কিছুই নাই। সন্ন্যাসীর জীবন "স্বাত্মার্থং পরোপকারায়"। বাস্তবিক 'স্বাত্মার্থং' না হইলে 'পরোপকারায়' হইতে পারে না। "আপনি অবশ হ'লি তবে বল দিবি তুই কারে", কবির এই কথাটি অতীব সত্য। সবল ব্যক্তিই পরোপকারে সমর্থ। চক্ষুস্মান্ ব্যক্তিই পথপ্রদর্শক হইতে পারে। অন্ধে পথ দেখাইলে উভয়েই পতিত হয়। "অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ" (মুণ্ডক ১।২।৮) পরোপকারেরও ব্যক্তিগত বাস্তবতাই স্বীকৃত। অন্যথায় পরোপকার হইতে পারে না। দয়া, স্নেহ,

ভালবাসা প্রভৃতি সকলই আত্মার্থ। আত্মার প্রিয়ত্বের জন্যই সকলে প্রিয়। শ্রুতিও বলিয়াছেন,—"ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়োভবত্যাত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি।" (বৃহদারণ্যক ২।৪।৫) পতির প্রয়োজনের নিমিত্ত কেহ পতিপ্রিয়া হন না ; কিন্তু আত্মসুখ সাধনরূপ প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্তই পতি প্রিয় হইয়া থাকেন। সংসারের যাবতীয় বস্তুই আত্মার জন্য প্রিয়। আত্মাই প্রিয়তর, প্রিয়তম। তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ অন্তরতরং যদয়মাত্মা"। (বৃহদারণ্যক ১।৪।৮) ব্রহ্ম—পুত্র, বিত্ত, এমন কি সমস্ত বস্তু হইতেই প্রিয়তর। আবার প্রাণাদি হইতেও অন্তরতর ; সুতরাং আত্মা অতিশয় প্রিয়। আমাকে ভালবাসি বলিয়াই প্রিয়জনকে ভালবাসি। স্ত্রীকে যে ভালবাসি সে আমার বলিয়া ; আমাকে ভালবাসি বলিয়া পুত্রকে, পিতাকে, মাতাকে, সকলকেই ভালবাসি। দয়া, স্নেহ, ভালবাসা, মূলতঃ এক, কেবল বাহিরের বিষয় অনুসারে একই বৃত্তির নানারূপে বিকাশ।

আততায়ী, অত্যাচারীকে বিনাশ করা ধর্ম্ম। "মা হিংসাৎ সর্ব্বভূতানি" এই সামান্য বাক্য যেমন

"জ্যোতিষ্টোমে পশুমালভেত" এই বিশেষ বাক্য দ্বারা বাধিত হয়, সেইরূপ "কাহাকেও হিংসা করিবে না" এই বাক্যের "আততায়ীকে হত্যা করিবে" এই বাক্য দ্বারা বাধ হয়। উৎসর্গকে (দেবোদ্দেশে দান—যজ্ঞ) পরিত্যাগ করিয়া যেরূপ সামান্যবিধির গতি ও ব্যাপ্তি, সেইরূপ এ ক্ষেত্রেও গ্রহণ করিতে হইবে। ব্রাহ্মণের অস্ত্র ধারণ করিতে নাই। আপস্তম্ব বলিয়াছেন—

"পরীক্ষার্থোঽপি ব্রাহ্মণ আয়ুধং নাদদীত॥"

(১, ১০, ২৯, ৬)

কিন্তু ইহার পরেই আবার বলিয়াছেন,—"যো হিংসার্থমভিক্রান্তং হন্তি, মন্যুরেব মন্যুং স্পৃশতি, ন তস্মিন্ দোষ ইতি পুরাণে"—আততায়ী হত্যা করায় ব্রাহ্মণেরও দোষ নাই। মনুও বলিয়াছেন—

"শস্ত্রং দ্বিজাতিভির্গ্রাহ্যং ধর্ম্মো যত্রোপরুধ্যতে।

দ্বিজাতীনাঞ্চ বর্ণানাং বিপ্লবে কালকারিতে॥" ৮।৩৪৮

যখন ধর্ম্ম উপরুদ্ধ, যখন কালবশে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বর্ণের বিপ্লব উপস্থিত হয়, তখন ব্রাহ্মণগণও অস্ত্র ধারণ করিবেন।

"আত্মনশ্চ পরিত্রাণে দক্ষিণানাঞ্চ সঙ্গরে।
স্ত্রীবিপ্রাভ্যুপপত্তৌ চ ধর্ম্মেণঘ্নন্ ন দুষ্যতি ॥" ৮।৩৪৯

নিজের পরিত্রাণের জন্য, যজ্ঞের দক্ষিণা কেহ বল পূর্ব্বক অপহরণ করিলে সেই সময়, যুদ্ধে স্ত্রী ও বেদপারগ ব্রাহ্মণগণের প্রতি অত্যাচার সময়ে ধর্ম্ম পুরঃসর হত্যা করিলে তাহা দোষাবহ হয় না।

"গুরুং বা বালবৃদ্ধৌ বা ব্রাহ্মণং বা বহুশ্রুতম্।
আততায়িনমায়ান্তং হন্যাদেবাবিচারয়ন্ ॥ ৮।৩৫০
নাততায়িবধে দোষো হন্তুর্ভবতি কশ্চন।
প্রকাশং বাঽপ্রকাশং বা মন্যুস্তংমন্যুমৃচ্ছতি॥" ৮।৩৫১

বালকই হউক, বৃদ্ধই হউক, গুরুই হউক, বহুশ্রুতি-পারগ ব্রাহ্মণই হউক, আততায়ীরূপে আগমন করিলে নির্ব্বিচারে তাহাকে হত্যা করিবে। প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য ভাবেই হউক, আততায়ীকে বধ করিলে হত্যাকারীর কোনও দোষ হইতে পারে না। কারণ হত্যাকারীর হিংসা আততায়ীর হিংসার প্রতিগমন করাতে তাহা দ্বারা প্রতিরুদ্ধ হওয়ায় হত্যাকারীর দোষভাগী হইতে হয় না, সেই হিংসা হিংসাভিমানিনী দেবতাতেই লীন হয়।

আততায়ী কে তাহাও বলা হইয়াছে, যথা—

"অগ্নিদোগরদশ্চৈব শস্ত্রপাণির্ধনাপহঃ।
ক্ষেত্রদারাপহারী চ ষড়েতেহ্যাততায়িনঃ॥
উদ্যতাসির্বিষাগ্নিভ্যাং শাপোদ্যতকরস্তথা।
আথর্বনেন হন্তা চ পিশুনশ্চাপিরাজনি॥
ভার্য্যারিক্‌থাপহারী চ রন্ধ্রান্বেষণ তৎপরঃ।
এবমাদ্যান্ বিজানীয়াৎ সর্ব্বাণেবাততায়িনঃ॥"

অগ্নিদাতা, বিষদাতা, অস্ত্রধারী, ধনাপহরণকারী, ক্ষেত্রাপহরণকারী ও স্ত্রী অপহরণকারী এই ছয় ব্যক্তি আততায়ী। যে ব্যক্তি অসি উত্তোলন করিয়া আসিতেছে, বিষ ও অগ্নি প্রদানে উদ্যত, যে ব্যক্তি শাপ দিতে প্রস্তুত, অভিচার দ্বারা যে ব্যক্তি হত্যা করিতে উদ্যত এবং যে ব্যক্তি রাজার নিকট গোপনে মিথ্যা রটনা দ্বারা রাজার মন ভাঙ্গাইতে চেষ্টা করে, স্ত্রী ও ধনাপহরণ করে এবং ছিদ্রানুসন্ধানকারী, এই সকলকেই আততায়ী বলিয়া জানিবে।

গুরু প্রভৃতির উল্লেখ অর্থবাদ মাত্র। অর্থাৎ গুরু প্রভৃতিকেও হত্যা করা যায়, অন্যের সম্বন্ধে আর বক্তব্য কি?

ধর্ম্মশাস্ত্রে দেখিতে পাই, যুদ্ধে মৃত্যু হইলে স্বর্গ লাভ হয়। মনু বলিয়াছেন—

"আহবেষু মিথোঽন্যোন্যং জিঘাংসন্তোমহীক্ষিতঃ।
যুধ্যমানাঃ পরং শক্ত্যা স্বর্গং যান্ত্যপরাঙ্মুখাঃ॥" ৭।৮৯

যুদ্ধে ক্ষত্রিয় পরস্পরকে আক্রমণ করিয়া সমস্ত সামর্থ্যের সহিত অপরাঙ্মুখ হইয়া যুদ্ধ করিলে স্বর্গলাভ করেন। অন্যত্রও বলিয়াছেন,—

উদ্যতৈরাহবে শস্ত্রৈঃ ক্ষত্রধর্ম্মৈর্হতস্য চ
সদ্য সন্তিষ্ঠতে যজ্ঞ ইতি॥"

যুদ্ধে উদ্যতাস্ত্র ক্ষাত্রধর্ম্মে হত ব্যক্তির সদ্যযজ্ঞ সাধিত হয়। পরাশরও বলিয়াছেন—

"দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে সূর্য্যমণ্ডলভেদকৌ।
পরিব্রাড্ যোগযুক্তশ্চ রণে চাভিমুখে হতঃ॥" (১)

ভগবান্ও গীতায় বলিয়াছেন,—

"হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।" (২)

তিনি আরও বলিয়াছেন,—

"ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছে্রয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে।"

(১) পঃ সং ৩।৩৭ (২) ২।৩৭

মনু বলিয়াছেন,—

"ন নিবর্ত্তেত সংগ্রামাৎ ক্ষাত্রং ধর্ম্মমনুস্মরন্।" ৭।৮৭

"সংগ্রামেষ্বনিবর্ত্তিত্বং প্রজানাঞ্চৈব পালনম্।

শুশ্রূষা ব্রাহ্মণানাঞ্চ রাজ্ঞাং শ্রেয়স্করং পরম্॥" ৭।৮৮

সর্ব্বত্রই বীরত্বের উপাসনা। জীবমাত্রই বীরত্বের উপাসক, সবলকে সম্মান করা আমাদের স্বভাব। প্রকৃতিতে যাহা মহান্, যাহা সবল, যাহা গম্ভীর, যাহা সৌন্দর্য্যের মহিমায় মণ্ডিত, তাহাতে আমরা স্বাভাবিক ভাবেই আকৃষ্ট হই।

শারীরিক বীর্য্য সম্পন্ন ব্যক্তি, মানসিক তেজঃ সম্পন্ন ব্যক্তি, অনন্ত আকাশ, বিরাট পর্ব্বত, অসীম সমুদ্র, সকল গুলিই আমাদের উপাস্য। আমাদের অন্তরে সবলতাব প্রতি শ্রদ্ধা স্বাভাবিক। যুদ্ধ-জয়ী বীরকে সম্মান করি, মনোজয়ী যোগীর নিকট মস্তক অবনত করি, জ্ঞানীর নিকট আত্মসমর্পণ করি, অনন্ত সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হই—ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। আমাদের সাধ্য বস্তু সবলতা, সাধনা সবলতা, আমাদের ব্যবহার সবলতা, সবলতাই ধর্ম্ম, সবলতাই উপাস্য। সবলতার মন্দিরে সবলতারূপ দেবতাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে

হইবে। সে স্থানে ভয় নাই, শোক নাই, মোহ নাই, সঙ্কোচ নাই, সন্দেহ নাই, সংশয় নাই; তাহা মহান্, শান্ত।

সপ্তম অধ্যায়।

সবলতার স্বরূপ।

সবলতার উপাসনা জীব জগতের সৃষ্টি হইতেই আরম্ভ হইয়াছে। বীর পুরুষকে কেন্দ্র করিয়াই সভ্যতার বিকাশ হইয়াছে। যুগের অবতার বা যুগ-প্রবর্ত্তক নিজের জীবনের বীরত্বে সাধারণকে অনুপ্রাণিত করেন। তাঁহার পদাঙ্কানুসরণ সাধারণ লোকের কর্ত্তব্যরূপে গৃহীত হয়। "বীরভোগ্যা বসুন্ধরা" বাক্যটী সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। ধর্ম্মবীরই হউন, কর্ম্মবীরই হউন, বীরসাধকই হউন, আর জ্ঞানীপ্রবরই হউন—সকলের চরণতলেই পৃথিবীর লোকসমূহ প্রণত। সবলতা জীবনের আদর্শ বলিয়াই বার পুরুষের জীবন আমাদিগকে মুগ্ধ করে। নিজে দুর্ব্বল হইলেও

অনেক সময় সবল ব্যক্তির দৃষ্টান্তে হৃদয় কেমন নাচিয়া উঠে। যুদ্ধের বাদ্যে, সৈন্যের শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে অগ্রসর হওয়াতে দুর্ব্বলেরও চিত্ত নাচিয়া উঠে। বীরত্বের উপাখ্যান অন্তর্নিহিত বীর-ভাবের উদ্বোধন করে। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের "Survival of the fittest" কথাটীর মূলে সবলতাই নিহিত। সংসারের ব্যবহার দেখিলেই প্রতীয়মান হয় যে, সবলই বাঁচিয়া থাকিতে পারে। সবলের জন্যই যেন বিধাতার সৃষ্টি। সবলতা অর্থে শারীরিক বলবত্তাই নহে—সবলতা অর্থে সর্ব্বাবগাহী শক্তি। বাস্তবিক, সবলতা ও গোঁড়ামিতে পার্থক্য আছে। মানসিক বলের প্রাধান্য আমরা সর্ব্বদা স্বীকার করিয়াছি। গোঁড়ামি প্রকৃত প্রস্তাবে দুর্ব্বলতার নামান্তর। অসংযত ব্যক্তিই দুর্ব্বল। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের সময় যুধিষ্ঠিরের মৌনভাব বীরত্ব, তাহা দুর্ব্বলতা নহে। যাঁহার চক্ষুর ইঙ্গিতে ভীমার্জ্জুন কৌরবকে বিধ্বস্ত করিতে পারিত, সেই যুধিষ্ঠির স্থির এবং ভীমার্জ্জুনও স্তব্ধ। যাহারা সবলতা ও গোঁড়ামির পার্থক্য বুঝিতে পারে না, তাহারা ভিতরের শক্তি উপলব্ধি না করিতে পারিয়া কেবল বাহিরের ঘটনাই বিচার করে এবং ইহাকে

দুর্ব্বলতা আখ্যা দেয়। গুরু গোবিন্দসিংহ পলায়নের সময় মুসলমান কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া গোমাংস খাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সে সময় যদি তিনি নিষিদ্ধ মাংস না খাইতেন, তাহা হইলে শিখজাতির প্রতিষ্ঠা হইত কি না সন্দেহ। বস্তুত ভাবি শুভাশুভ বিবেচনা না করিয়া কর্ম্ম করিলে তাহা তামসিক কর্ম্ম হয়। ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন—

"অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষম্।
মোহাদারভ্যতে কর্ম্ম যৎ তৎ তামসমুচ্যতে॥ ১৮।২৫

ভাবি শুভাশুভ, অর্থক্ষয় বা শক্তিক্ষয়, বাস্তবিক কর্ম্ম দ্বারা লোকহিংসা হইবে কি না, নিজের সামর্থ্য আছে কি না, তাহা না দেখিয়া মোহের বশে যে কর্ম্ম আরব্ধ হয়, তাহা তামসিক কর্ম্ম। ইহা হইতে স্পষ্টতর আর কোনও মানদণ্ডের আবশ্যকতা নাই। খৃষ্টান সমাজে Latimar ও Ridley প্রভৃতির জীবনদানের মূলে ঐ সত্যটিই নিহিত ছিল।

তাঁহারা জানিতেন, তাঁহাদের মৃত্যুতে সমাজের মঙ্গল হইবে। বৃথা শক্তি ক্ষয় হইবে না, তাই বলিয়াছিলেন—"Fire shall burn all England"

এই আগুনে সমস্ত ইংলণ্ডদেশ পুড়িয়া পবিত্র হইবে। রোম-সম্রাট নিরোর সময় যাঁহারা যীশুর জন্য (For Christ) প্রাণ দান করিয়াছিলেন, তাঁহারাও অনন্ত বিশ্বাসে সমাজের মঙ্গল কামনায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহাদের কর্ম্ম তামসিক নহে। কিন্তু যদি কোনও ব্যক্তি আত্মার অবিনশ্বরত্বে বিশ্বাস করিয়া বিনা প্রয়োজনে অগ্নিতে লম্ফ প্রদান করিয়া পুড়িয়া মরে, তাহা দুর্ব্বলতা ব্যতীত আর কিছুই নহে। ইহা যদি বীরত্ব হয়, তাহা হইলে আত্মহত্যার মত বীরত্ব আর কিছুই নাই। মনের ক্ষোভে কেরোসিনের আগুনে, আফিম খাইয়া, কিংবা উদ্বন্ধনে দেহত্যাগে কোন বীরত্বই নাই। পরন্তু তাহা দুর্ব্বলতার পরিচায়ক। চিত্ত দুর্ব্বল হইলেই লোকে আত্মহত্যা করে। সহনশীলতা দুর্ব্বলের ধর্ম্ম নহে, উহা সবলেরই ধর্ম্ম। সহনশীলতা সাত্ত্বিক বৃত্তি—উহা তামসিক অকর্ম্মণ্যতা নহে। ভিতরে ভিতরে গুমরিয়া মরা, কিন্তু বাহিরে সহিয়া যাওয়ার ভাণ তামসিকতা। তাই যুধিষ্ঠির প্রভৃতির অপমান সহ্য করা প্রকৃত প্রস্তাবে বীরত্ব। চঞ্চল ও দুর্ব্বল ব্যক্তিই বাহিরের ফাঁকা বীরত্বে মুগ্ধ হয়। প্রকৃত

বীরত্ব মানসিক শক্তির উপর নিহিত। জড়ভরত জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ, কিন্তু যানবাহক রূপে নিয়োজিত হইয়া রাজাকে বহন করিয়াছিলেন। ইহা কি তাঁহার দুর্ব্বলতা? হঠকারিতা দুর্ব্বলতারই নামান্তর; উহাকে যেন সবলতা বলিয়া গ্রহণ না করি। বুদ্ধির বলই প্রকৃত বল, ভগবৎ বলই প্রকৃত বল। মার্কণ্ডেয় ও বামদেব ঋষি প্রাণ রক্ষার জন্য কুক্কুর মাংস খাইয়াছিলেন। নিষিদ্ধ বস্তু গ্রহণ করা সঙ্কল্পের দৃঢ়তার পরিচায়ক নহে। সুতরাং হঠ্কারী হয়ত বলিবেন, না খাইয়া মরিলেই প্রকৃত বীরত্ব হইত। বাস্তবিক তাহা নহে; জীবনরক্ষাই ঐ ক্ষেত্রে আবশ্যক, উহাই বীরত্ব। সত্য ও মিথ্যার দ্বন্দ্বেও আমরা উহাই দেখিতে পাই। খুঁতখুঁতে লোকই বেশী দুর্ব্বল।

"Cowards die many a time
before their death,
The valiant never taste of
death but once."

কবির এই কথাও উহাই সপ্রমাণ করে। মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী জানিয়া চিরদিন খুঁতখুঁত করিয়া কেবল সংশয় ও সন্দেহ বশে জীবন যাপন বস্তুত মরিবার

পূর্ব্বে দশবার মরা। বীরহৃদয়ই প্রকৃত বীরপুরুষ; উত্তেজনার বশে প্রাণ দানে বীরত্ব আছে, কিন্তু বিন্দু বিন্দু রক্ত দিয়া বহু কালের সাধনায় জীবন দান অধিকতর বীরত্বের পরিচায়ক। সিংহ পশুরাজ, সবল; তাই একবার আক্রান্ত পশুকে ধরিতে না পারিলে আর ধরিবার চেষ্টা করে না। ইহা বীরত্বের দ্যোতক; পক্ষান্তরে কোনও যুধ্যমান্ পক্ষ প্রথমে "বৈতসী" (নম্রতাদি) বৃত্তি অবলম্বন করিয়া শেষে বল সঞ্চয় পূর্ব্বক শত্রুকে পরাহত করিলে তাহাও বীরত্বের পরিচায়ক। একজন যুদ্ধক্ষেত্রে অবলীলাক্রমে প্রাণত্যাগ করিল, তাহাতেও বীরত্ব। আবার একজন তপস্যায় নিমগ্ন থাকিয়া জীবনের অবসান করিল, তাহাতেও বীরত্ব।

অনেক সময় আমরা সন্ন্যাসীর মাপকাঠিতে গৃহীকে মাপি, এবং গৃহীর মাপকাঠিতে সন্ন্যাসীকে মাপি। ইহা অতীব অন্যায়। সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম ও গৃহস্থের ধর্ম্মে পার্থক্য আছে। জ্ঞানী ব্যক্তির জীবনে অনেক সময়ে পরের জন্য কতকগুলি আবরণ আবশ্যক হয়; বাহিরের ব্যবহারে লোকস্থিতির জন্য মর্য্যাদা রক্ষা বিদ্বান্ ব্যক্তিকেও করিতে হয়। এই জন্যই ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন—

"ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।
যোজয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্॥" ৩।২৬।

আচার্য্য শব্দের অর্থ পর্য্যালোচনা করিলে ইহাই প্রতীয়মান হয়। নিজে আচার করিয়া শিষ্যকে যিনি আচারে প্রবর্ত্তিত করেন তিনি আচার্য্য। "আচিনোতি ইত্যাদি।" সন্ন্যাসী আত্মার অবিনশ্বরত্বে বিশ্বাস করেন, তাই বলিয়া তাঁহাকে অগ্নিতে ঝাঁপ দিয়া মরিতে হইবে না, শূন্যে থুথু ফেলিয়া নিজের শরীরে লাগাইতে হইবে না। সর্ব্বভূতে সমজ্ঞানের অর্থ ব্যভিচার নহে। হস্তী নারায়ণ দেখিয়া মাহুত নারায়ণের আদেশ প্রত্যাখ্যান করা বীরত্ব নহে, উহা মূর্খতা। বিচারের বলই প্রকৃত বল। আত্মার বলে বলীয়ান্ হওয়াই প্রকৃত সবলতা। শ্রুতিও এই কথাই বলিয়াছেন—"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ," এই আত্মা বলহীন ব্যক্তি লাভ করিতে পারে না। কবি যে বলিয়াছেন—"বিকার হেতৌ সতি বিক্রীয়ন্তে যেষাং ন চেতাংসি তএব ধীরাঃ" অর্থাৎ বিকারের হেতু থাকিলেও যাঁহাদের চিত্ত বিকৃত হয় না, তাঁহারাই ধীর বা বীর; এই বাক্য অতীব সত্য। এই অবস্থা লাভ করিবার জন্য সাধক লোকসমাজ হইতে দূরে থাকেন।

কারণ, আন্তরিক শক্তির বিকাশ না হইলে তাহার পক্ষে লোকসমাজে মেলামেশা নিরাপদ নহে,—বিকারের হেতু থাকাতে অবিকৃত থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু এই গোপন সাধন তাঁহার দুর্ব্বলতার পরিচায়ক নহে। মন্ত্রগুপ্তি সবলতা। কেবল প্রকাশ্য ব্যাপারই সবলতার পরিচায়ক নহে। শক্তির উৎস ভিতরে, স্থূলদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিগণই বাহিরের দৃশ্যে মুগ্ধ হয়। উহা তাহাদের দুর্ব্বলতা মাত্র। অকালে ভূমি কর্ষণ করিয়া বীজ বপনের চেষ্টা সবলতা নহে। সংসারে যে একা চলে তাহার পক্ষে অনেক সময় হঠ্‌কারিতা সম্ভব; কিন্তু যে দশজনকে নিয়া চলিতেছে, সে বিচার করিয়া অবশ্যই চলিবে। তাহার পক্ষে নির্ব্বিচারে হঠ্‌কারিতা অতীব দোষাবহ, তাহা নিন্দনীয়; তাহা কখনই সবলতা নহে। Xenophone এর বর্ণনায় 'Retreat of the Ten Thousand' বীরত্বের কাহিনী এবং Leonidas এর থার্ম্মোপলিতে অবস্থান, প্রতাপের হল্‌দিঘাটের যুদ্ধও বীরত্বের নিদর্শন। Regulus এর বন্দাগৃহ হইতে ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় তাহাতে প্রত্যাবর্ত্তন করা বীরত্বব্যঞ্জক, Garibaldir বন্দীগৃহ হইতে পলায়ন ও Mazzinir লুক্কায়িত

অবস্থায় অবস্থানও বীরত্ব; উহা দুর্ব্বলতা নহে। আরংজেবের নজরবন্দী অবস্থা হইতে শিবাজীর কৌশলে পলায়ন কাপুরুষতা নহে। নেপোলিয়নের সৈন্যের সম্মুখে তাঁহার অবস্থানকালীন General Blucher এর সৈন্য-শ্রেণীর পলায়ন কাপুরুষতা নহে। বুয়র যুদ্ধে 'ডি ওয়েট' কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া রেলগাড়ীতে লর্ড কিচেনারের পলায়ন ভীরুতা নহে। তখন মোহের বশে ধরা দিলে কোন বীরত্বই প্রকাশ পাইত না। উত্তেজনার বশে কার্য্য করিলেই তাহা বীরত্ব হয় না। স্থির ধীর ভাবে সমগ্র শক্তি নিয়োগপূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া শক্তির প্রকাশই বীরত্ব। কংসের রাজত্বে মুক্ত পুরুষ প্রেমিক নারদকেও গোপনে হরিনাম নিবার ব্যবস্থা দিতে হইয়াছিল। যিনি জ্ঞানী, যিনি পরম ভক্ত, যিনি মুক্ত, তিনিও অত্যাচারীর প্রবলতা হইতে জীবগণকে রক্ষা করিবার জন্য গোপনেই কৃষ্ণনাম জপিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। কেবল কালের প্রতীক্ষার জন্য গোপনে সাধন করিতে বলিয়াছিলেন। নারদ জানিতেন কংসের পাপের মাত্রা তখনও পূর্ণ হয় নাই, কেবল অবসরের প্রতীক্ষায় ছিলেন। এক্ষেত্রে তিনি প্রকাশ্যভাবে হরিনাম করিতে না বলিয়া কি ভীরুতা প্রদর্শন

করিয়াছেন? অকালে কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গে কোনও ফল হয় না, অকালে বৃক্ষ রোপণ করিলেও বৃক্ষ বাঁচে না। তাই অনুকূল প্রতিকূল অবস্থা বিবেচনা করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হয়। তাহাতেই প্রকৃত বীরত্ব প্রকাশিত হয়। সাধারণ লোকের বাহাবার কোনও মূল্য নাই। আজ বাহাবা দিতেছে, আবার কল্য হয়ত সেই কার্য্যের জন্য গালাগালি দিবে। উপযুক্ত সময়ে বীরত্ব প্রকাশ করিতে হয়। আইকেরাস্ এর মত মোমের পাখা লাগাইয়া সূর্য্যকে ধরিতে যাওয়া বোকামি ব্যতীত আর অন্য কিছুই নহে। বারুদখানায় গোলাগুলি সংগ্রহ না করিয়া খরচ করা যায় না। ভিতরে শক্তি সঞ্চয় করিয়া বাহিরে প্রকাশিত কর। কবির ভাষায় বলিতে গেলে প্রকাশের সময় আছে—

হায়! সেকি সুখ, এ গহন ত্যজি
হাতে লয়ে জয় তূরী,
জনতার মাঝে ঝাপায়ে পড়িতে
রাজ্য ও রাজা ভাঙ্গিতে গড়িতে
অত্যাচারের বক্ষে পড়িয়া
হানিতে তীক্ষ্ণ ছুরি।

আবার বলিতেছেন—

"যাও রামদাস, যাওগো লেহারী, সাম্
ফিরে যাও তুমি।
দেখাওনা লোভ, ডাকিওনা মোরে
ঝাপায়ে পড়িতে কর্ম্মসাগরে,
এখনও পড়িয়া থাক্ বহুদূরে
জীবন রঙ্গ ভূমি।"

জীবনের উন্মেষের জন্য সাধারণত তপস্বী জন-কোলাহল হইতে দূরে থাকিয়া উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য মহামন্ত্র জপ করেন। তিনি বীর, তিনি দুর্ব্বল নহেন। তিনি বিশ্বাস করেন,—

কবে বলিতে পারিব পেয়েছি আমার শেষ।
আমার জীবনে লভিয়া জীবন জাগরে সকল দেশ॥

তিনি 'আপনার মাঝে আপনাকে আমি পূর্ণ দেখিব কবে' এই সাধনায় রত। তাই লোক-চক্ষুর অন্তরালে, নীরবে, গোপনে, নদীর কল্লোলের সহিত সুর মিলাইতেছেন। ইহা তাঁহার দুর্ব্বলতা নহে, ইহাই পরিপূর্ণ সবলতা। জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ ত্রৈলঙ্গ স্বামী যে অখাদ্য গোমাংস খাইতে চান